বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড.এ.কে.এম. হারুনার রশীদ

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

নাদিয়া কবির

এম.ফিল. গবেষক

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২-২০১৩

রেজিঃ নংঃ ২১১

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার" শিরোনামের গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য রচিত। এই গবেষণার বিষয়বস্তু আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি।

এম.ফিল. গবেষক
নাদিয়া কবির
রেজিস্ট্রেশন নং: ২১১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাদিয়া কবির আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ হতে "বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার" শীর্ষক এম.ফিল. এর অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করেছেন। মৌলিক তথ্যসমূহের সুবিন্যস্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে অভিসন্দর্ভটিতে। এর প্রতিটি অধ্যায়ই মূল্যবান এবং তথ্যবহুল। অভিসন্দর্ভটি গবেষক ডিগ্রির জন্য অন্য কোথাও উপস্থাপন করেননি। আমি তাঁর গবেষণাকর্মটি চূড়ান্তভাবে পর্যালোচনা করেছি এবং এটি এম.ফিল. ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য বলে প্রত্যয়ন করছি।

অধ্যাপক ড.এ.কে.এম. হারুনার রশীদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

মানুষের জন্যই মানবাধিকার। নৈতিকতার অভাবে মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন হয়। ইচ্ছা করলেই কেউ কারো কাছ থেকে এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। যখন কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তখনই মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটে। তাই মানবাধিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমি এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য "বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি নির্বাচন করেছি। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড.এ.কে.এম. হারুনার রশীদ। গবেষণার বিষয় নির্দিষ্টকরণ, গবেষণার কাঠামো পরিকল্পনা, গবেষণাটি কীভাবে তথ্য দিয়ে সুবিন্যস্ত করা যায়, মোট কথা গবেষণার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তাঁর দিক নির্দেশনা ছিল। তাই আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে দর্শন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার সহপাঠীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাদের সহযোগিতা এ গবেষণাকর্মটি রচনায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার জন্য গ্রন্থের উৎস হিসেবে আমি দর্শন বিভাগের সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, সাইন্স লাইব্রেরি, রোকেয়া হল গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল হল গ্রন্থাগার, পাঠক সমাবেশ এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা নিয়েছি। তাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতি।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া যাদের কথা না বললেই নয়, তারা হলেন আমার বাবা এ.কে.এম. হুমায়ূন কবির, মা সেলিনা কবির এবং ভাই সাজিদ-আল-কবির। তাদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে আমাকে সাহায্য করেছে। সবশেষে এ গবেষণা কাজের অনুমতি দেয়ার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নাদিয়া কবির
এম.ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণা পত্র	I
প্রত্যয়ন পত্র	II
মুখবন্ধ	III-IV
সূচিপত্র	**V**
ভূমিকাঃ	**১-৬**
প্রথম অধ্যায়ঃ রাষ্ট্রের রূপরেখা ও মানবাধিকারের জন্ম	৭-২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানবাধিকারের অবস্থান	২৭-৪২
তৃতীয় অধ্যায়ঃ বিশ্বে ও বাংলাদেশে মানবাধিকারের প্রেক্ষাপট	৪৩-৬২
চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে মানবাধিকারের পরিস্থিতি ও এর কার্যকারিতা	৬৩-৮০
পঞ্চম অধ্যায়ঃ মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ	৮১-৯৭
উপসংহার :	**৯৮-১০০**
গ্রন্থপঞ্জি :	**১০১-১০৭**

fwgKv

মানুষের ন্যায্য অধিকারই হলো মানবাধিকার। যা কখনো কেউ কারো কাছ থেকে সহজে ছিনিয়ে নিতে পারে না। যখন এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয় তখনই মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটে। মানবাধিকার কোনো একক ব্যক্তির অধিকার নয়, বরং তা বিশ্বের সকল মানুষের অধিকার। এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও অমানবিক। মানুষের সহজাত অধিকার ও ক্ষমতা রক্ষা করে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় অধিকার হলো মানবাধিকার। বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষায় বর্তমানে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বেড়ে চলেছে। যে কারণে আজ মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য অনেক আইন তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থাও কাজ করছে। মানবাধিকার কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয় না বরং জন্মসূত্রেই মানুষ এই অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই অধিকারসমূহ মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে রাখে, তাকে একটি পৃথক সত্তার মর্যাদা দান করে। এই অধিকার কখনো কেউ কাউকে প্রদান করতে পারে না, কারণ এটি তার সহজাত অধিকার।

মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সবকিছুর আগে প্রয়োজন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্লেটো[১] তার ন্যায়পরতার ধারণায় ব্যক্তির স্বাধীনতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ন্যায়পরতার বিরোধী। ন্যায়পরতা হলো এক ধরনের শক্তি, যে শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র তার সদস্যদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়, যাতে কেউ কারো প্রাপ্য হতে বঞ্চিত না হয়। এরিস্টটল[২] ন্যায্যতা বলতে বুঝিয়েছেন সুবর্ণ মধ্যককে। সুবর্ণ মধ্যক হলো অতিসবল ও অতিদূর্বল অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা। দুটি অবস্থার মধ্যে সমতার অবস্থাই হলো ন্যায়পরতা। এরিস্টটলের মতে অসমতার ক্ষেত্রে সমতা অথবা সমতার ক্ষেত্রে অসমতা প্রদান করা হলো ন্যায্যতার পরিপন্থী।

সমাজে ন্যায়বিচার রক্ষা করা হয় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ব্যক্তির অধিকার এবং ব্যক্তিকে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখে আইনের শাসন। নাগরিকদের জন্য প্রণীত যেকোনো বিধি-বিধান যা আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যাত, তাই হলো আইন। রাষ্ট্রকে বলা হয় আইনের স্রষ্টা। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সাংবিধানিক আইন দ্বারা, আর আইন দ্বারা রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয়। জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। পাশাপাশি নাগরিকরা যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য আইনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই বলা হয় আইন হলো এক প্রকার জীবনব্যবস্থা, যা অনমনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। সমাজে ন্যায়পরতা রক্ষার জন্য আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। যখন সমাজে অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করা হয় তখন আইনই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আইনের শাসন রয়েছে সব জায়গায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জন্য আইনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। সভ্যতার সমৃদ্ধি সাধনে এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

মানুষের অধিকার রক্ষার স্বার্থে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র জারি করা হয়। এই ঘোষণাপত্রটি মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকারের দলিল হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিনিয়তই পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্তেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশও এই পরিস্থিতির বাইরে নয়। বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা[৩] আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নানাভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত প্রতি ক্ষেত্রেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা নিয়ে এ গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত

বাংলাদেশের মানবাধিকারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানবাধিকারের উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাংলাদেশে মানবাধিকারের অবস্থান নিরূপণ করা এ গবেষণা কর্মের মূখ্য অনুসন্ধানের বিষয়।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে রাষ্ট্র কীভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে এবং কীভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রক্রিয়ায় মানবাধিকারের জন্ম হলো। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে মানুষের অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে মানুষ রাষ্ট্র গঠন করেছে। কেউই অধিকার ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানুষের সকল মৌলিক অধিকারের সমন্বয়েই মানবাধিকারের জন্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে মানবাধিকারের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের অধিকার রক্ষা করা নৈতিক কর্তব্য। নৈতিক সত্তা হিসেবে মানবাধিকার মানুষের নৈতিক অধিকার। এই অধিকারকে হরণ করা হলে তা হবে অনৈতিক। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে তা হবে অমানবিক।

বিশ্বে ও বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে। বিশ্বব্যাপী আজ মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন। দিন দিন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মানবাধিকার রক্ষার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি অধিকার রক্ষায় কাজ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য যেসব কর্মসূচী ও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে মানবাধিকার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এখানে প্রতিনিয়ত নারী ও শিশু নির্যাতন, সংখ্যালঘু নির্যাতন, সীমান্ত সংঘাত, শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটছে। এগুলো প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন এনজিও সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এসকল সংস্থা মূলত মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে থাকে।

মানবাধিকার কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং এর জন্য ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের অধিকার সংরক্ষণে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, যেমন: নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, যুদ্ধবিরোধী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, নির্যাতনের শিকার মানুষদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, শিশুশ্রম প্রতিরোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে যে পরিমাণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তার মূল কারণ হলো ন্যায়বিচারের অভাব। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যায়বিচারের কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সমাজে ন্যায়বিচার না থাকলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। অন্যায়কে রুখতে, পাশাপাশি মানুষের অধিকারকে রক্ষা করতে ন্যায়বিচারের প্রয়োজন। ন্যায়বিচার এমন এক শক্তি যা অন্যায়কে প্রতিরোধ করে সমাজকে ন্যায়ের পথে চলতে সাহায্য করে। মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার একে অপরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার ব্যাপারে সকল দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গীকার অনুযায়ী যদি

প্রতিটি দেশ মানবাধিকার সংরক্ষণে স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করে তাহলেই কেবল মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকার বঞ্চিত মানুষসহ সকল নাগরিকের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টিও এ গবেষণার একটি অন্যতম লক্ষ্য।

Z_¨wb‡‘k

১. গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে দার্শনিক প্লেটোর গুরুত্ব অপরিসীম। আদর্শ রাষ্ট্র এবং ন্যায়পরতাতত্ত্ব মূলত প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার দুটি মূল ভিত্তি। প্লেটো যেসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলোর ওপর পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর উত্তরসূরীরা।

২. প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল রাষ্ট্রদর্শনকে একটি স্বতন্ত্র ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তিনি ন্যায়পরতা বলতে দুটি অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বোঝান।

৩. সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হলো যা পালন করতে রাষ্ট্রের জনগণ বাধ্য। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নাগরিকদের কোন কাজটি করা যাবে এবং কোনটি করা যাবে না সে সম্পর্কে অবগত করে।

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

1g Aa¨vq

iv‡ói iƒc‡iLv I gvbewaKv‡ii Rb¨

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে রাষ্ট্র এবং অধিকার উভয়ই একে অপরের সাথে জড়িত। মানুষের অধিকারসমূহ রক্ষার দায়িত্ব সাধারণত রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। এই অধিকারসমূহকে রক্ষা করার প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্র বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান তৈরি করে। বর্তমান বিশ্বসভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছে সুদূর অতীতকালে। পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা যখন স্পষ্ট রূপ লাভ করে তখন থেকেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রথার জন্ম হয়। সকলে এই প্রথাসমূহ ও নিয়মকানুন মেনে চলতে শুরু করে। এই পথ ধরেই বিকশিত হয় সভ্যতা।

সভ্যতা বিবর্তনের একপর্যায়ে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ধারণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিক রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মত দিয়েছেন। রাষ্ট্র যে জনগণের জন্য কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান তা জানতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে বিধাতার মর্জিতে। মধ্যযুগীয় দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস একুইনাস এই মতবাদের প্রবক্তা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক মতবাদটি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত অন্যতম মতবাদ হলো বল প্রয়োগ মতবাদ। এই মতবাদের মূল কথা হলো শক্তি বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত দৈহিক শক্তির অধিকারীরা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব গোত্রের

ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পেতে একপর্যায়ে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়। সাধারণত শক্তির বলে সবলরা দূর্বলদের পরাজিত করে প্রভাব বিস্তার করে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রাচীন মতবাদগুলোর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অন্যতম। ধারণা করা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবারসমূহই বিস্তার লাভ করে পরবর্তীতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সৃষ্টি মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদে পরিবার পরিচালনার ক্ষমতা নারীর ওপর থাকে। তাই এই মতবাদের প্রবক্তারাও (যেমন, মরগান, ম্যাকলিন) মনে করেন মাতৃতান্ত্রিক পরিবার হতে রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ হলো সামাজিক চুক্তি মতবাদ। সামাজিক চুক্তির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে শাসনহীনভাবে বসবাস করত। প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হতো। শাসনহীন অবস্থায় মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা ছিল না। কেউ আইন অমান্য করলে তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না। একারণে সব মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে, যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় চুক্তিনামায় পরিণত হয়।

সামাজিক চুক্তি নিয়ে হবস্ তাঁর †jwfqv_vb[১] গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। হবস্ের মতে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত। সেখানে কোনো শাসন না থাকায় অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই অরাজক পরিস্থিতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। লক তাঁর *Two Treatises on civil Government*[২] নামক গ্রন্থে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সামাজিক চুক্তি নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেন।

লকের মতে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। মানুষের মতো প্রাকৃতিক আইনও সহজাত। রুশো তাঁর *Social contract* গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেছেন "মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায় কিন্তু সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলিত থাকে"।[৩] মানুষ নানাবিধ কারণে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে এবং রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে নিয়ম-নীতি পালন করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে অন্যতম আর একটি মতবাদ হলো ঐতিহাসিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র মূলত কিছু ঐতিহাসিক পথ অতিক্রম করে গড়ে উঠেছে। মানুষ যেমন বিবর্তনের ধারায় ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে তেমনি রাষ্ট্রও বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আধুনিকত্ব পেয়েছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ হলো মার্কসীয় মতবাদ। এ মতবাদ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা সমাজের একটা বস্তুগত ভিত্তি (অর্থনীতি) থাকে এবং একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন উপরিকাঠামোগত দিক। রাষ্ট্র হলো সমাজের ভিত্তি তথা অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভুত একটি উপরিকাঠামোগত দিক। মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী, রাষ্ট্র হলো শ্রেণী আধিপত্যের সংস্থা, শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজ বিকাশের একটা স্তরে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। মার্কস বলেন, সমাজ বিকাশের এক একটি স্তর উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি স্তরে সামাজিক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবির্ভূত হয়। সমাজ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে (আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর) যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল তখনই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

রাষ্ট্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; এর একটি হলো সার্বভৌম ক্ষমতা ও অন্যটি হলো আইন। সরকার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলে এবং যে বিধান অনুসারে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তাকে বলে আইন। রাষ্ট্রের সরকারকে এক ধরনের

পরিচালকমণ্ডলী বলা যায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকে সার্বভৌম সংসদ এবং রাজতন্ত্রে থাকে সার্বভৌম রাজা। রাষ্ট্রের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য আইনের দিকেও মনোনিবেশ করতে হয়। রাষ্ট্রের আইন মূলত তার নিজের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রতিটি সমাজে রাষ্ট্রের আইন অবশ্য পালনীয়। রাষ্ট্রের আইন থেকে কখনো মুক্ত হওয়া যায় না। এক রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রে গেলে অন্য রাষ্ট্রের আইনের আওতায় পদার্পন করতে হবে। আইনের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত দুইই নিয়ন্ত্রিত হয়। বিচার-আচারের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিধান রচিত হয়, তারই সুস্পষ্ট প্রকাশিত রূপ হলো আইন। আইনের সীমাবদ্ধতা ও ব্যাপকতা মূলত রাষ্ট্রের আয়তনের ওপর নির্ভর করে। আইন সম্পর্কে টি.এইচ.গ্রিন বলেন, "সমাজের নৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলো যে কাজ করা উচিত বা যা থেকে বিরত থাকা উচিত, তা করা বা না করা তা সে যে কোন মানসিকতা থেকে হোক না কেন"।[৪]

সরকার আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে এবং ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। আইন হঠাৎ করে বর্তমান অবস্থায় আসেনি। আদিম সমাজে প্রথাই ছিল সমাজের নিয়ন্ত্রক। প্রথাকে এক প্রকার অলিখিত আইন বলা হতো। অবশ্য রাজনৈতিক বিধানসমূহ থেকে প্রথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্টি হয়নি। আদিম সমাজে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাই ছিল প্রথা নিয়ন্ত্রিত। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথাসমূহ আইনে রূপান্তরিত হয়।

আইন সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় প্লেটোর চিন্তায়। তিনি তাঁর *Laws*[৫] গ্রন্থে দেখান যে পরিবার ও সম্পদ হলো কর্তৃপক্ষের নিজস্ব সম্পদ। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে যে রাজি হবে না, সেই রাজ্যে তাঁর কোনো স্থান নেই। ঐতিহাসিক দলিলসমূহ থেকে পাওয়া যায়, প্রাচীন গ্রীসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং গ্রীসেই সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বজনের নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলে। গ্রীসে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ শাসনব্যবস্থায় অংশ নিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

প্রত্যেক নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করে। বর্তমানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইনসভায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন বিচার বিবেচনার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচিত করা জনগণের অধিকার। জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, মতামত প্রকাশে বাধা প্রদান ইত্যাদি গণতন্ত্র পরিপন্থী কাজ। প্রাচীন গ্রীসেই সর্বপ্রথম আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত অংশসমূহের সকল মানুষ একত্রিত হয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করার অধিকার পায়।

প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত আইনপ্রনেতা ও রাজনীতিবীদ ছিলেন সোলোন।[৬] সকল শ্রেণীর মানুষের অনুপ্রেরণায় তিনি শাসক হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি এমন কিছু আইন প্রণয়ন করেন, যার আলোকে এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রে বেশকিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে যা বলেছেন, তাঁর মূল বক্তব্য হলো অভিন্ন লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বাধীন জনগণ একত্রিত হয় যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে। ডেমোক্রিটাস[৭] যে রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছেন তাকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা হয়।

মানব জাতির বিবেকের পক্ষে অধিকারসমূহের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা হলো অপমানজনক। প্রতিটি মানুষ সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি আছে। তাই তাদের একে অপরের প্রতি মানবিক মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ। ব্যক্তি হিসেবে আইনের চোখে সকলেরই স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে। অর্থাৎ সকলেই আইনের চোখে সমান। যে কার্যাদির জন্য আইনের দ্বারা প্রদত্ত অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয়, সেগুলোর জন্য আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার গ্রহণের অধিকার সকলেরই রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সর্বজনীন মানবাধিকার নীতিমালা অনুসরণ করা হলেও অবিশ্বাস্যভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অথচ বিশ্বমানবতা আজ মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকার আদায়ের নামে

মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা, শক্তি প্রদর্শন, যুদ্ধ, বোমা হামলা এগুলো সবই মানবাধিকারের সংকটের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাষ্ট্রে মানুষ বিভিন্ন অধিকার ভোগ করে থাকে। রাষ্ট্রই মানুষের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে। সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের অধিকারসমূহ রক্ষার্থে অনেক যুদ্ধ ও আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। মানুষের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের ওপর। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র অধিকারসমূহ রক্ষা করে। মানুষের অধিকারসমূহ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও যেমন আলোচনা করা হয় তেমনি নীতিবিদ্যায়ও আলোচনা করা হয়। কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিদ্যার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের আলোকে মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়, তেমনি নীতিবিদ্যায় নৈতিকতার দিক হতে অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানুষের অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো বাঁচার অধিকার, কাজ করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি। মানুষের নৈতিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই অধিকারসমূহ পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অধিকার বিষয়টি জড়িত। অধিকারের মধ্যে আইনসম্মত অধিকার ও নৈতিক অধিকার নামক দুই ধরনের বিশেষ অধিকার লক্ষ্য করা যায়। আইনসম্মত অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে নৈতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা আইনের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে সমাজ অধিকারসমূহের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে পারে। তবে মানুষের নৈতিকতা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ হলো তাঁর অধিকারগুলো পরিপূর্ণরূপে পূরণ করা।

আইন ও নৈতিকতা পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তিটা তৈরি হয় জনগণের মতামতের দ্বারা। জনগণের মতামতের মূলে যে ইচ্ছা রয়েছে তা হলো রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে জনগণের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই আইন মানতে জনগণ বাধ্য। কিন্তু নৈতিকতা সৃষ্টি হয় মানুষের ইচ্ছার দ্বারা। নৈতিকতায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু একটি রাষ্ট্রকে সফল হতে হলে এর আইনগত ভিত্তি ও নৈতিক ভিত্তি দুটোতেই পরিপূর্ণ হতে হয়।

জন লক[৮] রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকৃতির রাজ্য ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতির রাজ্য বলতে তিনি এমন পরিবেশকে বোঝান যেখানে সবসময় পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করত। প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান ছিল প্রকৃতির আইন। অর্থাৎ প্রকৃতির আইনের মধ্যে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার বিরাজ করত। প্রকৃতির রাজ্যে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক অধিকারের বা স্বাভাবিক অধিকারের ওপর মানুষের দাবি জন্মায়। প্রকৃতির অধিকার হলো মানুষের ন্যায্য অধিকার। অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেসব অধিকারের ওপর মানুষের দাবি জন্মে সেগুলো হলো প্রাকৃতিক অধিকার। প্রকৃতির রাজ্যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রকৃতির আইন মেনে চলতে হতো। প্রকৃতির আইনে সকলের অধিকার সমান। সমাজ যাতে ধ্বংস না হয় সেদিকেও প্রকৃতির আইন লক্ষ্য রাখে।

রাষ্ট্রে মানুষের বিভিন্ন অধিকার অর্থাৎ নাগরিক অধিকার রয়েছে। অধিকার বিভিন্ন ধরনের হলেও প্রধান অধিকারগুলো হলো নৈতিক অধিকার, জন্মগত অধিকার ও আইনী অধিকার। মানুষের বোধশক্তিসমূহ নৈতিক অধিকারের অন্তর্গত। যেমন: মানবতাবোধ, নীতিবোধ, বিবেকবোধ ইত্যাদি। যেসকল অধিকার আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় না সেসকল অধিকারকে জন্মগত অধিকার বলে। যেমন: জীবনধারণের অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার অধিকার। নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক

অধিকার ইত্যাদি আইনী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পেশা বাছাইয়ের স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতাসমূহ নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের সকল অধিকারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মানবাধিকার। মানুষের ন্যায্য অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মানবাধিকার। মানুষের জীবনধারণ করার জন্মগত অধিকারের অন্যতম নাম হলো মানবাধিকার। মানুষকে তার জন্মগত অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হলো অন্যায়। ঐতিহাসিক দলিলসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রীসে "মানবাধিকার" বিষয়টি ন্যায়পরতা নামে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রীক রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ন্যায়বিচারের যে প্রকাশ, তার অনেকটাই নির্মান করেছেন গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস।[৯]

ন্যায়পরতা প্রসঙ্গটি সুবিন্যস্ত সমাজকাঠামোর মূলে বিদ্যমান। ন্যায়পরতা ধারণাটির আলোচনা অনেক পূর্বে শুরু হলেও সর্বপ্রথম গ্রীক দার্শনিক প্লেটো *The Republic* গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা দেন।[১০] প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান বিষয়ই ছিল সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের অন্যতম গুণ হলো ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার কোনো একক বা বিশেষ শ্রেণীর গুণ নয়। প্রতিটি মানুষের যার যা প্রাপ্য তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়বিচার। প্রত্যেকে তার কাজ ঠিকমতো করলে যে শুধু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে তা নয়, বরং সমাজও নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় সকলের মানবাধিকার সংরক্ষণ করা। যেমন, গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। এরিস্টটল ন্যায়পরতা সম্পর্কে তাঁর *Nicomachean Ethics*[১১] গ্রন্থে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন ন্যায়পরতাই হলো সমতার জন্য সঠিক মানদণ্ড। এরিস্টটল মনে করেন ন্যায়পরতা হলো ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা। মধ্যযুগের দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাসের[১২] মতে ন্যায়পরতা হলো ব্যক্তির অভ্যাস, যা অন্যান্য সকল মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদানের শক্তি প্রদান করে। আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম মনে করেন, ন্যায়পরতার উদ্ভব মানব মনস্তত্ব থেকে।[১৩] অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে উপযোগবাদী দার্শনিকরা সামাজিক উপযোগিতাকে ন্যায়পরতার ভিত্তি বলে মনে করেন। উপযোগবাদীদের মতে, মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য নেই। জন স্টুয়ার্ট মিল ন্যায়পরতার ধারণাকে সমতা নীতির ধারণার অংশবিশেষ বলে মনে করেন।[১৪] সমাজের প্রয়োজনের ওপরই কোনটি ন্যায্য কোনটি অন্যায্য তা নির্ভর করে।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস[১৫] এর রচনার মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা লক্ষ্য করা যায়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সামাজিক মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা সামাজিক বৈষম্য দূর করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। মার্কস তাঁর *Critique of the Gotha programme*-[১৬] এ সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য বন্টনের নীতি প্রণয়ন করেছেন, যাকে বন্টনধর্মী ন্যায় বলে গণ্য করা হয়।

জন রলস্ *A Theory of Justice*[১৭] গ্রন্থে ন্যায়পরতাতত্ত্বকে উপযোগবাদের বিকল্প মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মূলত দুটি নীতির আলোকে তাঁর ন্যায়পরতাতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম নীতিটি হলো, সকলের স্বাধীনতা লাভের ও ভোগের সমান অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় নীতিটি হলো, চাকরি, পদমর্যাদায় সুযোগ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সমান সুযোগ লাভ করা। জন রলস্ একটি উদার-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ন্যায়পরতার নীতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

ন্যায়বিচার মনুষ্যসৃষ্ট আইনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় দেখা যায়, সেখানকার রাজা হাম্মুরাবি সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার্থে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছিলেন।[১৮] যেমন, কেউ কারো চোখ তুলে নিলে, এর বদলে শাস্তিস্বরূপ অপরাধী ব্যক্তিরও চোখ তুলে নেওয়া হতো। অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত ইত্যাদি। রাজা হাম্মুরাবি আইনের ক্ষেত্রে অনেক কঠোর ভূমিকা পালন করেন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই দেখা গেছে শাসকরা তাদের সুশাসন বজায় রাখার জন্য এবং সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে অনেক কঠোর আইন প্রণয়ন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

মধ্যযুগে মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে ম্যাগনা কার্টা (১২১৫)[১৯] নামক চুক্তি হয়। ম্যাগনা কার্টাকে মানবাধিকারের প্রথম বিশেষ পদক্ষেপ বলা যায়। এই পদক্ষেপটি রাজা ও জমিদার শ্রেণী ব্যারণদের মধ্যকার এক প্রকার চুক্তি ছিল। সমাজ বিবর্তনের মাধ্যমে নানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অতিক্রম করে মানবাধিকার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এছাড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল যেমন, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৭৭৬)[২০], ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকার সনদ (১৭৮৯)[২১], বলশেভিক বিপ্লবের বাণী (১৯১৭)[২২], ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকার স্পষ্ট হয়ে উঠে।

পরবর্তীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) ধ্বংসলীলা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষদের ভাবিয়ে তোলে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে, বিশ্বে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৬ সালে একটি রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। অবশেষে ১৯১৯ সালে তিনি বিখ্যাত প্যারিস সম্মেলনে তাঁর ঘোষিত চার নীতি, চৌদ্দ দফা শর্ত এবং পঞ্চ ব্যাখ্যা প্রভৃতি উপস্থাপন করেন। এর ফলে ১৯১৯ সালের ২৮ এপ্রিল জাতিপুঞ্জ[২৩] আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তীতে জাতিপুঞ্জ বিশ্বের মানুষের শান্তি রক্ষা ও শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। তাই সবদিক বিবেচনা করে ১৯৪৬ সালে জাতিপুঞ্জকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) মূল কারণই ছিল ভার্সাই চুক্তি।[২৪] এই যুদ্ধের সময় জার্মানী ও ইতালির নৃশংসতা পুরো বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। মানবাধিকার রক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সানফ্রানসিসকোতে একটি সনদের অনুমোদনের মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫] এই সনদটি ছিল মানুষের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার আন্তর্জাতিক দলিল। মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রটি ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে উপস্থাপিত হয়। সর্বজনীন ঘোষণার মূল কথাই হলো সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান এবং প্রত্যেকে সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মানবাধিকার নিয়ে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মানবাধিকার বিষয়টি প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল। কিন্তু জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার আজ কোনো দেশের একক বিষয় নয়, বরং তা আজ আন্তর্জাতিক বিষয়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদই মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা গুরুত্ব বহন করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় জাতিসংঘ মানবাধিকার রক্ষার জন্য সকল দেশ ও প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিশ্বের শান্তি, ন্যায়বিচার তখনই সম্ভব যখন সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত হবে। পৃথিবীতে মানুষের প্রতি অবিচারের ফলে অনেক বর্বরোচিত ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। তাই সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন হতে রক্ষার জন্য আইনের শাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা অতি প্রয়োজনীয়।

মানবাধিকার হলো প্রাকৃতিক। একে সহজাতও বলা যায়। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ হলো আইনের শাসনের বাইরে না গিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পাদন করা। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশের শাসনতন্ত্রে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ধারাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানুষের অধিকারসমূহে কোনোরূপ বিচ্যুতি বা বিভক্তি দেখলে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে প্রতিনিয়ত জবাবদিহি করতে হয়। এ জন্যই গণতন্ত্রকে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার ২১ নং ধারায় যুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, আন্তর্জাতিক সংকট প্রশমন এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের জাতিসংঘ। এই বিশ্বসংস্থা মানবাধিকার ধারণাটির প্রতিফলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বাস করতেন যে, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের জন্য প্রয়োজন যুদ্ধের আশঙ্কা কমানো। জাতিসংঘ সনদে প্রাথমিক খসড়াগুলোতে একটি অধিকার বিল যুক্ত ছিল (১৯৪২ ও ১৯৪৩)। কোনো দেশকে তখন বিশ্বসংস্থায় যোগ দিতে হলে এই অধিকার বিলের বিধানগুলো মেনে নিতে হতো। তবে অধিকার বিলের বিধানসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য শেষ পর্যন্ত স্থির করা হয়, অধিকার বিলের সামান্য কিছু অংশ জাতিসংঘ সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং মানবাধিকার কমিশনকে একটি আন্তর্জাতিক অধিকার বিল প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হবে। মানবাধিকার কমিশন একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল প্রণয়ন করে, যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়। এই অধিকারগুলো সার্বজনীন বলে কথিত। সাধারণ মানুষ হিসেবে সকলে এই অধিকারের অংশীদার। মানবাধিকারগুলো আন্তর্জাতিক কর্মব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ফলাফলস্বরূপ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি মানবাধিকার চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি হলো ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশন। এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫০ সালে। বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম

২১টি অনুচ্ছেদে যেসব অধিকার সন্নিবেশিত আছে, ইউরোপীয় মানবাধিকারের কনভেনশনেও সেসব অধিকারের বিবরণ আছে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুগামী হিসেবে একইরকম আরো অনেক চুক্তির পরিকল্পনা করেছিল জাতিসংঘ। ১৯৫৩ সালে কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পেশ করা হয়। স্নায়ুযুদ্ধজনিত বৈরিতার কারণে এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মানবাধিকার চুক্তি প্রণয়ন সমর্থন বাতিল করে নেওয়ার ফলে চুক্তিগুলো ১৯৬৬ সালের আগে সাধারণ পরিষদে অনুমোদন পায়নি। পরবর্তীতে সময়ের পরিক্রমায় যখন চুক্তিগুলো ভেস্তে যাবার অবস্থা তখন জাতিসংঘ সীমিত আকারে কিছুসংখ্যক চুক্তি তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্র সই না করলেও অনেক দেশ এগুলোতে সই করে। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ ১৯৬৬ সালে সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের পর সেগুলো সদস্য দেশগুলোর ওপর বাধ্যতামূলক করার জন্য ৩৫টি দেশের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। ১৯৭৬ সালে এই স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। বর্তমানে এই চুক্তিগুলো আন্তর্জাতিক আইন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করলেও মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে পৃথকভাবে কোনো পরিষদ গঠন করেনি। বরং জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৬৮ অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সীমাবদ্ধ পদক্ষেপের মাধ্যমে শুরু হলেও জাতিসংঘ মানবাধিকার রক্ষায় অগ্রগতি সাধন করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানবাধিকারের জন্য প্রণীত আইনসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন কৌশলপত্রও গৃহীত হয়েছে।

জাতিসংঘ ২০০৬ সালে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির জরুরি অবস্থায় মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য মানবাধিকার কমিশনের স্থলে মানবাধিকার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘে মানবাধিকার কাউন্সিল মানবাধিকার কমিশনের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সহায়ক অঙ্গ নয় বরং এটি সাধারণ পরিষদের অঙ্গ। আঞ্চলিক কোটা পদ্ধতিতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ৯ মে ২০০৬ সালে কাউন্সিলের ৪৭ জন সদস্য মনোনিত করা হয়। মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় ১৯ জুন ২০০৬ সালে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৩০টি অনুচ্ছেদেই পৃথক পৃথকভাগে মানুষের অধিকারসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখিত প্রতিটি অধিকার সমান তাৎপর্যপূর্ণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের মধ্যে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের স্বাধীনভাবে একদেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু বেশকিছু দেশে মানুষ এই অধিকার হতে অবহেলিত হচ্ছে। যেমন: নির্যাতন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে মানুষ নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্যদেশে আশ্রয় নিতে পারে। এই আশ্রয় লাভের অধিকার তার আছে।

সমাজের সর্বনিম্ন একক হলো পরিবার। পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। সমাজের প্রত্যেকেই সম্পত্তির মালিক হতে পারে, স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কাউকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও অযৌক্তিকভাবে কারো সম্পত্তি দখল করা যাবে না।

সর্বজনীন মানবাধিকারে যেসকল নীতির কথা বলা হয়েছে তাতে সমাজব্যবস্থা পরিচালনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নির্দেশও রয়েছে। জনগণের ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। প্রত্যেকেরই

রাষ্ট্রের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। এরকম কাঠামো ছাড়া মানুষের অধিকার রক্ষা করা দুঃসাধ্য। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের নীতিমালাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সকল অবস্থার জন্য আলাদা করে বিধান রয়েছে। এই বিধানগুলো ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তীতে জাতিসংঘে আরো তিনটি সনদ গৃহীত হয়। এই তিনটি সনদ এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, মোট ৪টিকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধানাবলী সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম সনদটি মূলত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানবাধিকারসমূহ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ। যা ১৯৬৬ সারের ১৬ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি হতে কার্যকর হয়। এই সনদে রয়েছে মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। সকল জাতিই তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে নিজেদের উপকারে যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় সনদটিও একই তারিখে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সনদটি মূলত রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত আইন হিসেবে গৃহীত হয় সাধারণ পরিষদে। এই সনদেও মানুষের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও জরুরী অবস্থায় ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। ঐ তারিখেই রাজনৈতিক ও নাগরিকদের একটি আন্তর্জাতিক অপশোনাল প্রোটোকল হিসেবে ৩য় সনদটি গৃহীত হয়। কোনো ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের সম্মুখীন হন, তবে তিনি এর প্রতিকার চেয়ে মানবাধিকার

কমিটিতে আবেদন করতে পারবেন। মানুষের জীবন ধারণ করার জন্মগত অধিকার হিসেবে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া অথবা লঙ্ঘন করা অন্যায় ও অমানবিক।

Z_¨wb‡‘k

১. Thomas Hobbes, *Leviathan*, University Of Oregon, USA, 1999, p. 104.

২. John Locke, *Two Treatises On Civil Government*, Henry Regery, Chicago, 1962, p. 106.

৩. W. A. Dunning, *A History Of Political Theories (Rousseau To Spencer)*, The Macmillan Company, Norwood Press, Mass.,1920, p. 6.

৪. T. H. Green, *Lectures On The Principles Of Political Obligation*, Batoche Books, Kitchener, 1999, p. 15.

৫. w‘ jm গ্রন্থটি প্লেটোর এক অনবদ্য সৃষ্টি। wicvewjK নামক গ্রন্থে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। আদর্শ রাষ্ট্রে আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু পরবর্তীতে jm নামক গ্রন্থে প্লেটো রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনের শাসনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

৬. সোলোন (খৃ:পূ:৬৩৮-৫৫৯) প্রাচীন গ্রীক রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা। আইন প্রনেতা ও রাজনীতিবীদ হিসেবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। সোলোনের সময় প্রতিষ্ঠিত আইন এথেন্সের রাজনীতি ও সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

৭. ডেমোক্রিটাস (খৃ:পূ:৪৬০-৩৭০) প্রাচীন গ্রীসের পরমাণুবাদী দার্শনিক। তিনি মনে করতেন বস্তুজগৎ হলো বহুসংখ্যক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। ডেমোক্রিটাস রাষ্ট্রকে নৈতিকতার এবং আদর্শের বিকশিত রূপ বলে মনে করেছেন।

৮. John Locke, *Two Treatises On Civil Government*, Henry Regery, Chicago, 1962, p. 106.

৯. পিথাগোরাস প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও গনিতবিদ ছিলেন। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা উচিৎ বলে তিনি মনে করতেন। পিথাগোরাসের মতে সমাজের ভিত্তি হলো দুটি-ন্যায়বিচার এবং যুক্তিবাদিতা।

১০. সরদার ফজলুল করিম, প্লেটোর wicvewjK, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৬৮।

১১. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, Batoche Books, Kitchener,1999, p. 32.

১২. মধ্যযুগের স্কলাস্টিসিজম এর একজন বিখ্যাত দার্শনিক সেন্ট টমাস একুইনাস। নৈতিকতাকে তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শাসককে অবশ্যই ন্যায়নিষ্ঠসম্পন্ন হতে হবে বলে সেন্ট টমাস একুইনাস মনে করেন।

১৩. এ. এস. এম. আবদুল খালেক, mvgwRK b¨vqwePvi I Rb ijm, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯।

১৪. cv, 3, পৃ. ২১।

১৫. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস হলেন সমাজতন্ত্রের সমর্থক। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করে মানুষে মানুষে সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। KwgDwb÷ †gwb‡d‡÷v সহ প্রধান রচনাগুলোতে তাঁরা পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকট তুলে ধরেছেন এবং তা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

১৬. কার্ল মার্কস, "গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, iPbv msKjb, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ১৮।

১৭. জন রলস্ বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার একজন নৈতিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক। *A Theory of Justice* গ্রন্থে তিনি ন্যায়পরতাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1971.

১৮. হাম্মুরাবি ছিলেন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিখ্যাত রাজা। তিনি একজন সফল আইন-প্রনেতাও ছিলেন। তাঁর সময়কালে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য খুবই কঠোরভাবে আইন অনুসরণ করা হতো।

১৯. ম্যাগনা কার্টা চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ১২১৫ সালের ১৫ জুন। এটি মানবাধিকার রক্ষায় ১ম বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে মধ্যযুগে গঠিত হয়। চুক্তিটি হয় ইংল্যাণ্ডের রাজা জন ও জমিদার শ্রেণী ব্যারণদের মধ্যে।

২০. আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভানিয়া স্টেট হাউজে সম্পাদিত হয়। এটি আমেরিকার ১৩টি কলোনিতে ঘোষণা করা হয়।

২১. ফরাসি বিপ্লব সংঘঠিত হয় ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে ক্ষমতা পরিচালনা করত চার্চ। রাজা চার্চের নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হতেন। পরবর্তীতে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষের অধিকারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিপ্লব সমাপ্ত হয় যখন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ক্ষমতায় বসেন।

২২. ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঘটে। রাজা দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসনের পতনের মাধ্যমে তখন ক্ষমতা গ্রহণ করে নতুন ভারপ্রাপ্ত সরকার। এরপর সকল ক্ষমতা চলে যায় সোভিয়েতদের হাতে।

২৩. জাতিপুঞ্জ মূলত প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ফলাফলস্বরূপ জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়।

২৪. ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে। ভার্সাই চুক্তি হয় জার্মানী এবং মিত্র শক্তির মধ্যে।

২৫. ২য় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা বন্ধে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। প্রথমে এর সদস্য ছিল ৫১ জন, বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

2q Aa¨vq

ˆbwZKZvi ‘wó‡Z gvbewaKv‡ii Ae¯vb

প্রতিটি মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো তাঁর অধিকারসমূহ। এই অধিকারসমূহ রক্ষার পেছনে শুধু আইনই কাজ করে না, বরং এর পেছনে নৈতিক ভিত্তিও কাজ করে। একটি সমাজে মানুষের নৈতিকতা মূলত নির্ভর করে সমাজস্থ মানুষ যেসব নীতিসমূহ সঠিক বলে গ্রহণ করতে একমত হয়েছে তার ওপর। কাজের ভাল বা মন্দ নির্ণয়ের সঠিক মাপকাঠি হলো নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজের নৈতিকতা বিকাশের অন্তরালে রয়েছে ন্যায়পরতা। ন্যায়পরতার মানদন্ডসমূহের বিচারেই নৈতিকতা বিকশিত হয়।

ঐতিহাসিক দলিলসমূহ থেকে দেখা যায় নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার প্রয়োজনেই মানুষ রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং রাষ্ট্রকে ন্যায়পরতা ও আইনকানুনের সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। যখন একটি সরকার তার নাগরিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয় তখন নাগরিকরাই ঐ সরকারকে উৎখাত করতে পারে। গ্রহণযোগ্য শাসককে বেছে নেওয়া হলো জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার ও নৈতিক দায়িত্ব।

মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণের শ্লোগান ছিল “মুক্ত মানুষ হিসেবে বাঁচ, নয় মর”। ফরাসী বিপ্লবের শ্লোগান ছিল “সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা”। এরূপ প্রতিটি আন্দোলনের অভ্যন্তরে ছিল নৈতিকতা। জনগণের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হচ্ছিল দেখেই আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি

রাষ্ট্রের ন্যায়পরতা ও নৈতিকতা সে দেশের জনগণের উপর নির্ভর করে, কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক হলো জনগণ। রাষ্ট্রের নিকট হতে নিরাপত্তা লাভ করা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক অধিকার। যেমন: প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় রাজা হাম্মুরাবির নজরে সকল মানুষের সমান অধিকার ছিল। তিনি যে আইন প্রণয়ন করেন, তাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো। যেমন: দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। পারস্য রাজা সাইরাসত্ত তাঁর শাসনতন্ত্রে মানুষের মানবিক অধিকার সংরক্ষণ এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বর্তমানে মানুষের অধিকার নিয়ে যে ব্যাপক আলোচনা করা হয় পূর্বে এমনটা ছিল না। সভ্যতা বিকাশের এক পর্যায়ে মানুষের মানবিক অধিকারকে বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মানুষকে দাসে পরিণত করা হতো। বিভিন্ন সময়ে মানুষের অধিকারসমূহ নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। যেকারণে আজ বিশ্বসমাজের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ করা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানবাধিকার এবং এর নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর "সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র" প্রচারের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা থেকেই মানবাধিকারের উৎপত্তি। মানবাধিকার ধারণাটি অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন: ১৭৭৬ সালে গৃহীত অধিকারের বিলসমূহে (Bill of Rights)[১] মানুষের স্বাধীনতা, ন্যায্য অধিকার ও মানুষে মানুষে সমতা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার সংবিধানেও মানুষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এছাড়াও মানুষ যে দাস নয়, সেজন্য দাস প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ওপর ইংলিশ বিল, আমেরিকার সংবিধান ও ফ্রান্সের ঘোষণাপত্রের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র। এই ঘোষণাপত্রের প্রতিটি অনুচ্ছেদে পৃথক পৃথক আলোচনা সাপেক্ষে মানবাধিকারকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের জন্মগতভাবে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নয়। বিষয়টি মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে আরো বিস্তারিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে ১২১৫ সালে ব্রিটেনের ম্যাগনা কার্টাকে মানবাধিকারের বিশেষ পদক্ষেপ বলা যায়। ম্যাগনা কার্টা এমন এক চুক্তি, যেখানে রাজা ব্যারণদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এই চুক্তিটি হওয়ার অনেক পরে একে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। চতুর্দশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী সময়কালের মধ্যে রাষ্ট্র ব্যক্তির ওপর অবাধ কর্তৃত্ব অর্জন করে। এক্ষেত্রে ম্যাকেয়াভেলি[২] এবং মার্টিন লুথার কিং[৩] এর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। পরবর্তীতে মানুষের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়। ধীরে ধীরে মানুষের অধিকারের প্রসঙ্গটি অনেক দেশের শাসনতন্ত্রে যুক্ত হয়।

মানবাধিকার, নিরাপত্তা, নৈতিকতা এবং বিশ্ব শান্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে। জাতিসংঘ বিভিন্ন নীতিবোধ পর্যালোচনা করে সর্বজনস্বীকৃত মানবাধিকারের বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এসকল বিধিমালা সর্বজনীন বলেই সকল জাতি এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার ঘোষণার পর থেকে প্রসঙ্গটি বিশ্বে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব হলো নিজ নিজ দেশের মানবাধিকার সংরক্ষণ করা। জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার পথ আরো সুগম করে দিয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মূল উদ্দেশ্যই হলো সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ

সর্বজনস্বীকৃত এমন একটি মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করা যাতে সকল মানুষ সহজে জীবননির্বাহ করতে পারে। জাতিসংঘ মানুষের নৈতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার কমিশন গঠন করেছে। মানবাধিকার কমিশনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহকে সংরক্ষণ করা, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের পূর্ণ তদন্ত করা।

মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে সার্বিক সচেতনতা প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এনে প্রথম গুরুত্ব প্রদান করে জাতিসংঘ। মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধজ্ঞাপন জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। যা জাতিসংঘ সনদের ১(৩) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা আছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত সকল ধরনের উদ্যোগ, কর্তব্য ও ব্যবস্থা জাতিসংঘ সনদের ৫৫(গ) এবং ৫৬ নং অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা জাতিসংঘের অন্যতম দায়িত্ব। জাতিসংঘ সনদের ৫৫(গ) নং অনুচ্ছেদে আছে, জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সর্বজনীন মর্যাদা প্রদান জাতিসংঘের কর্তব্য। অনুচ্ছেদ ৫৫ তে বর্নিত দায়িত্বসমূহ সম্পূর্ণ করতে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘকে সহযোগিতা করবে বলে উল্লেখ রয়েছে জাতিসংঘ সনদের ৫৬ নং অনুচ্ছেদে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা। মানবাধিকার বিষয়টি জাতিসংঘে পেশ করার জন্য ১৯৪৭ সালে এলিনর রুজভেল্টের সভানেত্রীত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণার একটি খসড়া তৈরি করা। অনেক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রায় আড়াই বছর পর মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণার খসড়া তৈরি করা হয়। ১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে খসড়াটি অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। ঐ বছর ১০ই ডিসেম্বর প্রস্তাবটি স্বীকৃতি লাভ

করে। সাধারণ পরিষদে তখন ৫৮টি সদস্য রাষ্ট্র উপস্থিত ছিল। এর মধ্যে ৪৮টি রাষ্ট্র প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। প্রতিবছর ১০ই ডিসেম্বর যাতে "মানবাধিকার দিবস" পালন করা হয় সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৯৫০ সালের ৪ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা হয়। এর পর থেকে প্রতিবছর ১০ই ডিসেম্বর "মানবাধিকার দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে মানুষের নৈতিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত অধিকারসমূহের আলোচনা রয়েছে। কোনোরূপ অবহেলা ও বৈষম্যকে এখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৫০তম বর্ষ পূর্ণ হয়। এই ঘোষণার ৫০তম বর্ষ পূরণ উপলক্ষে এক বক্তৃতায় জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেন "মানবাধিকার হচ্ছে মানব অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সহ-অবস্থানের ভিত্তি। মানবাধিকার সর্বজনীন, অবিভাজ্য ও পরস্পর সম্পর্কিত। শান্তি ও উন্নয়ন অর্জনের জন্য জাতিসংঘের যে আকাঙ্ক্ষা তার হৃদপিণ্ড হচ্ছে মানবাধিকার ..... মানবাধিকার আপনাদের অধিকার, এটিকে অধিকার করুন, লালন করুন ও ঋদ্ধ করুন। মানবাধিকারকে প্রাণময় করুন।"[৪]

মানবাধিকার মানুষের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মানুষের কাছ থেকে তাঁর অধিকার কেড়ে নেওয়া বা অধিকারকে পৃথক করার চেষ্টা করা প্রকারান্তরে ঐ ব্যক্তির মূল্যবোধকে কেড়ে নেওয়া। কখনো কোনো বিশেষ মর্যাদার ভিত্তিতে মানবাধিকারের উদ্ভব ঘটে না। বরং মানবাধিকার হলো মানুষের জন্মগত ন্যায্য নৈতিক অধিকার। মানবাধিকার ব্যক্তিকে যেমন তাঁর নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তেমনি অন্যের অধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন কাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। ধীরে ধীরে সে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। অর্থাৎ মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। আদিম মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই টিকে ছিল। ফলে এসময় মানবাধিকার নিয়ে কোনোরূপ চেতনার বিকাশ ঘটেনি। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আদিম সমাজে মানুষে মানুষে কোনো

বৈষম্য ছিলনা। এজন্য এই সমাজকে বলা হত আদিম সাম্যবাদী সমাজ। মানুষ যে জন্ম থেকেই স্বাধীন, সমমর্যাদার অধিকারী, তা ব্যক্ত করা হয়েছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১ নং ধারায়:"সকল মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে, সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিৎ।"[৫]

নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করলে বলা যায়, কারো স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো অন্যায়। মানুষ যখন আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে পশুপালনের যুগে পদার্পন করল, তখনই প্রথম শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হলো। এ যুগ থেকে শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে পেতে তা চরম আকার ধারণ করল শিল্পযুগে। বৈষম্য দূর করার জন্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আবশ্যিক হয়ে পড়ে। মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১ নং ধারায় মানুষের সমমর্যাদার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ হতে পারে না। কিন্তু সমমর্যাদার বিষয়টি অনেক সময় উপেক্ষিত হয়। শুধুমাত্র গায়ের রং কালো হওয়ার কারণে অনেক মানুষ উপেক্ষিত। কিন্তু বর্তমানে কোনোভাবেই মানুষকে অসমান বলার অবকাশ নেই। প্রতিটি মানুষের সমঅধিকারের পাশাপাশি সমান মর্যাদাও আছে।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলে সমান দাবিদার। মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২য় ধারায় আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ করা হয়েছে কোনো দেশ স্বাধীন হোক বা অস্বায়ত্তশাসিত হোক, সেক্ষেত্রে তার অধিবাসীদের প্রতি কোনোরকম বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। বৈষম্য কখনো নৈতিকতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের তৃতীয় ধারায় বলা আছে "জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।"[৬] এই ধারার মূল বিষয়বস্তু হলো মানুষের স্বাধীনতার অধিকার ও জীবনের অধিকার রক্ষা করা। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে মানুষের স্বাধীনতার অধিকার বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এখনো হত্যা, গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা অব্যাহত আছে। বর্তমান সময়ে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি মাত্রায় লঙ্ঘিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা। তবে অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধারণা করা হয় দাস প্রথার অবসান হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হলেও আজও পরোক্ষভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে বহু দেশে দাস-প্রথা বিদ্যমান। পূর্বে যেভাবে মানুষকে দাস বানিয়ে বিক্রি করা হতো, তা হয়তো এখন আর করা হয় না। কিন্তু দাসকে যে পরিমাণ কষ্টের শিকার হতে হতো তা এখনো অন্তরালে বহুলোককে ভোগ করতে হয়। যেমন: ঋণের বোঝা, দারিদ্র্যের কারণে সন্তান বিক্রি ইত্যাদি। যারা মানুষকে দাসে পরিণত করে বিক্রি করতে পারে, তাদের নিকট হতে কখনো ন্যায়নীতি আশা করা যায় না। দাস প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল ইউরোপে, পরে তা প্রসারিত হয় আফ্রিকায়। কালো মানুষদের দাস হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে শ্বেতাঙ্গরা। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বে অনেক জায়গায় নারীদের সাথে দাসের মতো আচরণ করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে যেসব দেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে দাসপ্রথার অনুরূপ প্রথা বিদ্যমান আছে, সেসব প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থার সাহায্য। যারা ক্ষতিগ্রস্থ তাদের জন্য ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই কাজ করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। কোনো কোনো দেশে অনির্ধারিত সময়ের জন্য

কাজ করার জন্য চুক্তি করা হয়। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ টাকা কর্জ করে এবং কর্জদাতার টাকা শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হয়। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশেও দাস প্রথা অবসানের জন্য কাজ চলছে। মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ আছে যে অনেক দেশে ছোট ছেলে মেয়েদের জোরপূর্বক কাজ করানো হচ্ছে। নানা দেশে ছোট ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে অস্বাস্থ্যকর, অমানবিক পরিবেশে কাজ করে যাচ্ছে। এসকল অমানবিকতা বন্ধে অনেক দেশেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি সে দেশের ওয়ার্কারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিশুদের শ্রম বন্ধে যেসকল পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো কার্যকর করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

"কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে আবদ্ধ করা যাবে না। সকল জায়গায় ক্রীতদাস প্রথা এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হবে।" (৪নং ধারা)।[৭] দাসব্যবস্থাই মূলত দূর্বলদের ওপর সবলদের প্রভুত্ব করার অধিকার দিয়েছে। সামাজিক বৈষম্যই দাস প্রথার জন্ম দিয়েছে। দাস ব্যবস্থায় দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কঠোর পরিশ্রমের ফলে গড়ে ওঠা সমাজের ওপর কর্তৃত্ব করে কিছু সংখ্যক ক্ষমতাশালী মানুষ। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে যারা প্রভুর জন্য কাজ করে, সে সকল বঞ্চিত মানুষরাই হলো দাস। মানুষ হিসেবে তাদের নৈতিক অধিকারকে বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতাবানরা কাজ করিয়ে নেয়। এজন্য যাতে মানুষকে দাসে পরিণত না করা যায় এবং মানুষের নৈতিক অধিকার যাতে করে খর্ব না হয় সেটাই মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা আছে।

উপনিবেশিকতার অভিশাপ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আজো দাসপ্রথা রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে নারীর অবস্থা এখনো দাসীর মত। অনেক দেশে দারিদ্র্যের কারণে মানুষ টাকা ধার করে এবং টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যেতে হয়।

জাতিসংঘের সনদে আত্মনিয়ন্ত্রণকে একটি মূখ্য নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ মানুষকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া না হয় তাহলে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা সম্ভবপর হবে না। জাতিসংঘ সনদের প্রথম ধারায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারাটি প্রবর্তণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে অবস্থিত উপনিবেশসমূহ-এর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যখন একটি দেশের শাসন অন্য দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন শাসিত দেশকে উপনিবেশ বলা হয়। উপনিবেশের সাধারণ জনগণের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ও মর্যাদা থাকে না। তাই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হবার পর হতে উপনিবেশসমূহ স্বাধীনতার জন্য কামনা করে আসছে। তাই ১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসমূহ-এর স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘোষণায় অনেক দেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ হতে বলা হয়েছে উপনিবেশগুলোতে সর্বপ্রকার বল প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে উপনিবেশগুলোকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিলাভে সাহায্য প্রদান করতে হবে। উপনিবেশগুলোর যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার উপর কর্তৃত্ব উপনিবেশগুলোরই থাকবে।

পারস্পরিকভাবে সমঅধিকারের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা জাতিসংঘের সনদের প্রথম ধারার পাশাপাশি ৫৫ নম্বর ধারাতেও বলা রয়েছে। মূলত আত্মনিয়ন্ত্রণকে বলা হয় সমষ্টিগত মানুষের অধিকার। উপনিবেশে এই অধিকার লঙ্ঘন করা হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসারে একটি গোষ্ঠী যখন অন্য গোষ্ঠীর শাসনে থাকে, তখন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে থাকতে বাধ্য করাকে মানবাধিকারের লঙ্ঘন বলা হয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকারকে জাতিসংঘ বেশি গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। জাতিসংঘ সংগ্রামকারী জাতিসমূহকে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। উপনিবেশিকতা হতে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে অনেক কাজ করে আসছে।

জাতিসংঘ সৃষ্টির পর হতে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮৬টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সবসময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু কোনো কোনো রাষ্ট্রের অসহযোগিতার কারণে এই সাফল্যে কিছুটা হলেও সমস্যার সৃষ্টি করে।

কাউকে বিনা বিচারে ইচ্ছামত গ্রেফতার বা নির্বাসন দেয়া যাবে না। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৯ নং ধারায় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। খেয়ালখুশীমত যেকোনো মানুষের প্রতি অবিচার করা অন্যায়। জাতীয় বিচার আদালতের কাছ থেকে প্রতিকার লাভের নৈতিক অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে।

মানবাধিকার ঘোষনাপত্রের ১৩ নং ধারায় আছে যে, নিজের দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলা ফেরার অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে। এছাড়া যেকোনো দেশ পরিত্যাগ ও নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার সকলেরই রয়েছে। ব্যক্তিকে এই অধিকার হতে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু অনেক দেশেই মানুষ এই অধিকার হতে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষকে এভাবে বঞ্চিত করা অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ।

যেকোনো দেশের নাগরিকের জন্য জাতীয়তা একটি অন্যতম বিষয়। কোনো ব্যক্তিকেই তাঁর জাতীয়তা হতে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। জাতীয়তার অধিকার প্রসঙ্গে ঘোষণাপত্রের ১৫ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয়তা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের অধিকার নয় বরং তা সকল মানুষ, সকল শ্রেণীর অধিকার। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় ইউরোপের কোনো স্থানীয় জনপদে "জাতীয়তা" সম্পর্কিত ধারণার প্রথম জন্ম।[৮] স্ব স্ব দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, আবেগ ও অনুরাগ

হতে দেশপ্রেম গড়ে উঠে। এটাই হলো নাগরিকের জাতীয়তার প্রধান উপাদান। নৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে কোনো নাগরিককে নিজ দেশের জাতীয়তা হতে বঞ্চিত করা অন্যায়।

সর্বজনীন মানবাধিকারের **১৯** নং ধারায় মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত অধিকারসমূহ কেউ কাউকে দান করে না। মানুষ হিসেবে জন্মেছে বলে অধিকারগুলো তাঁর প্রাপ্য। কোনো কারণ ছাড়া ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ, বিনা কারণে মতামত প্রকাশে বাধা প্রদান, ইচ্ছামত নাগরিকদের গ্রেফতার, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ। এতে মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। মানবাধিকারে বাধা প্রদান করা অন্যায়। মতামত প্রকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ হলো মানুষের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে খর্ব করা হলো মানবাধিকারকে অবজ্ঞা করা। বর্তমান বিশ্বে মানুষ আজ মানবাধিকারের বিষয়ে অনেক সচেতন। তাই তারা নিজেদের মতামত প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মতামত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় সুশাসন, স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন থাকবে এবং সর্বোপরি মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে।

২০ নং ধারার **১** নং এ বলা হয়েছে- "প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।" এছাড়া ২ নং এ আছে- "কাউকে কোনো সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।"[৯] বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ ও ৩৮ নং অনুচ্ছেদে সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে জনগণের স্বার্থের কথা মনে রেখে এবং আইনের দ্বারা উল্লেখিত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সমাবেশে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। অন্যদিকে জনশৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করেও সংঘ গঠন করার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। কাউকে জোরপূর্বক কোন সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোন সংগঠনে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয় তবে তা নৈতিক দৃষ্ঠিকোন থেকে অন্যায়।

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২১ নং ধারায় আলোচনা করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি। জনগণই হলো প্রধান শক্তি। কারণ জনগণই দেশের শাসক নির্বাচিত করে। জনগণের শাসনই হলো নির্বাচিত সরকারের নৈতিক ও আইনি ভিত্তি। জনগণ এমন সরকার গঠন করবে, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ লাভের অধিকার পাবে। প্রাচীন গ্রীসে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত। বর্তমানে সাধারণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে। মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২২ নং ধারায় বলা হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায় করতে হয়। এসব অধিকার লাভ করার সুযোগ ছাড়া মানুষের নৈতিকতার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে। যা মানুষের মূল্যবোধ বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য মূল্যবোধ বিকাশের প্রয়োজন আছে।

২৬ নং ধারায় শিক্ষালাভের অধিকার, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার জন্য শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা হতে হবে এমন, যা জাতি ও গোত্রের মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক রক্ষার কাজ করবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সম্ভব একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। তাই বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য জাতিসংঘ শিক্ষার ওপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৯ নং ধারায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাজের প্রতি ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সার্বিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির নৈতিকতা, অধিকার ইচ্ছামত নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য আইনের শাসনেরও প্রয়োজন আছে। এই ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে কোনো অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না।

কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তি ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত ধারাসমূহ থেকে প্রদত্ত অধিকার ও স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে পারবে না। ঘোষণাপত্রের ৩০ নং ধারায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সীমাবদ্ধ পদক্ষেপের মাধ্যমে শুরু হলেও বর্তমানে মানবাধিকার ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে। বিগত বছরগুলোতে মানবাধিকার রক্ষা ও এর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জাতিসংঘ ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। মানবাধিকার সংরক্ষণে অনেক আন্তর্জাতিক আইন হয়েছে এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের কৌশলপত্র তৈরি হয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণার প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু অধিকার জাতিসংঘে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। তাই ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ শিশুদের অধিকার সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ ১৯৫৭ সালে দাসপ্রথা, দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করেছে। তেমনি রাজনৈতিক আশ্রয়লাভের অধিকার বিষয়ে ঘোষণাপত্রও জাতিসংঘ প্রস্তুত করেছে। মানুষের অধিকার যাতে কোনোভাবে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকেই জাতিসংঘ দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছে।

মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি কমিটি রয়েছে। যেমন: মানবাধিকার কমিটি, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ কমিটি, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটি, নির্যাতন বিরোধী কমিটি, শিশুর অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত

কমিটি, অভিবাসী শ্রমিক সংক্রান্ত কমিটি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত কমিটি।

চুক্তিব্যবস্থাসমূহ মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পদক্ষেপ। কিন্তু চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নে ব্যাপক বিপত্তি হচ্ছে। বর্তমানে চুক্তি বাস্তবায়নে বড় বাধা হচ্ছে, চুক্তি হলে সকল রাষ্ট্রই তা মেনে নেয় কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন করে নামে মাত্র। চুক্তিব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন কর্তৃত্ব শক্তিশালী করা। পাশাপাশি প্রয়োজন লোকবল বৃদ্ধি করা, যাতে চুক্তিব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। সকল চুক্তি কমিটির দায়িত্ব হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে থেকে সঠিক সময়ে প্রতিবেদন গ্রহণ করা। রাষ্ট্রসমূহ সঠিক সময়ে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হলে তবে তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। বর্তমান চুক্তি ব্যবস্থার সফল দিক হচ্ছে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্য পৃথক চুক্তি কমিটি রয়েছে। যেমন: নারীর জন্য কমিটি, শিশুর অধিকার রক্ষায় কমিটি ইত্যাদি।

মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে যে, এই ঘোষণাটি সকল জাতি ও মানুষের অধিকারের মাপকাঠিস্বরূপ। তাই উক্ত ঘোষণাপত্রটির দিকে লক্ষ্য রেখেই সকল জাতি, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি অধিকার সম্পর্কিত তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা অন্যায়। মানুষের অধিকারগুলো যে নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি তা অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা অমানবিক।

Z_¨wb‡'k

১. "বিল অব রাইটস্" এ মূলত ১০টি সংশোধনী বিদ্যমান। বিলটি লিখেছেন জেমস্ ম্যাডিসন। এখানে মূলত মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ম্যাকেয়াভেলী ছিলেন ইটালীর একজন রাষ্ট্রদার্শনিক। তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের জনক বলা হয়। তিনি রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র, শাসক ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে তত্ত্ব নির্মান করেছেন।

৩. মার্টিন লুথার কিং ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত গণঅধিকার কর্মী। তিনি মূলত মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৪. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, gvbewaKvi: 50 eQ‡ii AMhvÎv "মানবাধিকার, অন্ধকার থেকে আলোর পথে", ঢাকা, ১৯৯৯,পৃ. ৫।

৫. তোফাজ্জল হোসেন, RwZmsN, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩০৬।

6. cv¸³।

৭. ডঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, gvbewaKvi I mgvRKg, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.৩২৯।

৮. আল ওয়াহিদ, bvMwiK Wv‡qix, আলোড়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৬।

৯. ডঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, gvbewaKvi I mgvRKg©, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫,পৃ. ৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

Dhaka University Institutional Repository

3q Aa¨vq

we‡k l evsjv‡‘‡k gvbewaKv‡ii †cÿvcU

মানবাধিকার হলো মানুষের জন্মগত ন্যায্য অধিকার। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির এই জন্মগত অধিকার সহজে ছিনিয়ে নিতে পারে না। জন্মগত অধিকার যখন ছিনিয়ে নেয়া হয় তখনই মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। মানবাধিকার রক্ষা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে অধিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের অনেক স্থানেই প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। যেমন, স্বৈরাচারী শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার হতে বঞ্চিত ইত্যাদি। তবে পাশাপাশি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোকে মানবাধিকার রক্ষার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাকে নীতি সম্বলিত ঘোষণা বলা যায়। "মানব-অধিকার" বিষয়ক ঘোষণা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশ্বের শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘ এর কার্যক্রম অনেক পূর্ব থেকেই পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘের কার্যক্রম সত্ত্বেও বিশ্বের অনেক স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্বে অনেক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে। এসব যুদ্ধের কারণে মানুষের দুর্ভোগ যেমন বেড়েছে তেমনি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের

ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের হার অনেক বেড়ে যায়। যেমন: আরব-ইসরাইল এর মধ্যে এ পর্যন্ত চারটি যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে। বর্তমানেও নিজস্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের মধ্যে অস্থিতিশীল সম্পর্ক বিরাজ করছে। প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলের সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তিক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসরাইল বেশিরভাগ সময়ই প্যালেস্টাইনের নিরীহ জনগণের ওপর নির্যাতন ও হামলা চালাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো ৮ জুলাই ২০১৪ থেকে ২৬ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত ইসরাইল কর্তৃক প্যালেস্টাইনের ওপর পরিচালিত হামলা। এসব হামলার কারণে নিরীহ মানুষ সবসময় নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটায় যা মানবাধিকারের নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসরাইল প্যালেস্টাইনের হামাস[১] সংগঠনটিকে ধ্বংস করার প্রত্যয় নিয়ে গাজায় এই হামলা পরিচালনা করে। এতে অনেক মানুষ হাতহত হয়। গাজার স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতে এই হামলায় কমপক্ষে ২৩১০ জন নিহত হয়েছে।[২]

প্যালেস্টাইনের সমস্যা কোনো নতুন বিষয় নয়। এই সমস্যাটি জাতিসংঘকে বিচলিত করলেও এর কোনো সমাধান সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, মানবাধিকার কমিশন এবং অন্য সকল সংস্থা প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের জন্মগত অধিকার কখনো অস্বীকার করেনি। ইসরাইল অনেক আগে থেকেই প্যালেস্টাইনে হামলা করে আসছে। এতে প্রতিদিনই সেখানে অনেক মানুষ নিহত এবং গৃহহারা হচ্ছে। জাতিসংঘ এই হামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এর সঠিক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। এই হামলার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও ইসরাইল প্রতিনিয়ত মানবাধিকারকে অবজ্ঞা করে যাচ্ছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে যেসব নীতির কথা বলা হয়েছে, তা পালন করা বিশ্বের প্রতিটি দেশের অপরিহার্য দায়িত্ব। কিন্তু ইসরাইল এসব নীতিমালাকে সবসময় লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। বিশ্বেও সকল মানুষ চায় জাতিসংঘ যেন এদিকে দৃষ্টি দেয় এবং জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে আল-কায়দা হামলা চালায়। এতে প্রায় ২৯৯৬ জন নিহত

হয়।[৩] এই হামলাকে লক্ষ্য করে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্র আল কায়দাকে নির্মূল করার জন্য আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে। এতে করে প্রতিদিন অনেক সাধারণ মানুষ নিহত হতে থাকে। আজও অনেক মানুষ বিভিন্ন বোমা হামলা, গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ও প্লেন হামলায় নিহত হচ্ছে। ফলে এখানে মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

আল কায়দা মানবাধিকারকে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি। তারা আফগানিস্তানকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল যেখানে শিশু ও নারীদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আফগানিস্তানের অনেক জায়গায় মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মানবাধিকারে কোনো বৈষম্য স্থান পেতে পারেনা, মানবাধিকার মানুষকে নৈতিক হতে শেখায়। কিন্তু আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ।

আল কায়দার শাসনের পর আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মানবাধিকারের লঙ্ঘনই বেশি ঘটছে। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে কখনোই ভাল কিছু অর্জন করা যায় না। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রীবাহী ৪টি বিমান আঘাত হানে। এই হামলায় প্রায় ২,৯৯৬ মানুষ নিহত হয়।[৪] বর্তমান সময়ের প্রযুক্তি ও মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার সন্ত্রাসবাদের পথকে আরো সুগম করে দিয়েছে। একজন শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য এটা চিন্তা করা মোটেও কঠিন কিছু নয় যে, সন্ত্রাসবাদই মূলত সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঘটায়। সন্ত্রাসবাদ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে ফেলে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় শিকার হলো নিরীহ মানুষ, বিশেষ করে নারী ও শিশু। জাতিসংঘের সনদে ও বিভিন্ন প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদ দূরীকরণের জন্য লক্ষ্য ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে বেশির ভাগ দেশ একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের কারণে হামলার শিকার হন পাকিস্তানের সোয়াত প্রদেশের মালালা ইউসুফজাই। মালালার ওপর ২০১২ সালের ৯ই অক্টোবর

হামলা করা হয়। মালালা মূলত মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ব্লগে লিখতেন। সেই ভয়ংকর হামলা থেকে রক্ষা পেয়ে ২০১৪ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। যা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অনেক বড় উদাহরণ।[৫] এছাড়াও ২০০৩ সালে তেজস্ক্রিয় অস্ত্রকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যুদ্ধ পরিচালনা করে। সেই যুদ্ধে এ পর্যন্ত অনেক বেসামরিক ও নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে। ঐ সময় প্রতিদিনই ইরাকে কোনো না কোনো শহরে বোমা হামলা ও গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে বহু মানুষ হাতহত হয়।

যে মনোভাব মানুষকে আরেকজন মানুষের চেয়ে সর্বোচ্চ মনে করতে শেখায় তাকেই বলা হয় বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির ফলে অন্যকে নিচে রেখে উপরে থাকার উগ্র বাসনার সৃষ্টি হয়। বৈষম্যের মনোবৃত্তি বাতিলের জন্য আইনই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সকল মানুষের মর্যাদার প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে সব রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৬৫ সালের ২১ ডিসেম্বর সবরকম বর্ণগত বৈষম্য দূর করার জন্য জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নীতিমালা গ্রহণ করে। এই নীতিমালাটি কার্যকর হয় ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি। এতে বলা আছে যে, কোনো ধরনের বর্ণগত বৈষম্য দেখা গেলে উক্ত আইনের আলোকে জাতিসংঘ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বর্ণবৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। মানুষকে শুধুমাত্র বর্ণবৈষম্যের কারণে অবিচার ভোগ করতে হচ্ছে। এসকল বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বাত্মক প্রয়োগ।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে সিরিয়ায়। সেখানে অনেক মানুষ আজ গৃহহারা। মানুষ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়লাভের আশায় অন্যদেশে গমন করছে। এতে শরণার্থীর সংখ্যা দিনে দিনে অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে ১২৫ মিলিয়ন রিফুজি আছে। যদি এই ১২৫

মিলিয়ন নিয়ে একটি দেশ গঠিত হয় তবে তা ১১তম বৃহত্তম জাতি/দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।[৬]

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বশান্তি স্থাপন করা। কিন্তু নানা দ্বন্দ্ব, সমস্যায় পৃথিবী আজ জর্জরিত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, যার কারণে সুস্থ জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। অনেক জায়গায় মানুষ গৃহহীন, আশ্রয়হীন, ছিন্নমূল অবস্থায় জীবনযাপন করছে। বর্তমানে পৃথিবীতে নানা সংঘাতের কারণে প্রায় দেড়কোটি মানুষ ছিন্নমূল অবস্থায় রয়েছে। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৪৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংস্থা নামক একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক স্থাপিত হয়। সাধারণ শরণার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় নারী ও শিশুরা। তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সবক্ষেত্রে তারাই বেশি বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সিরিয়ার সাধারণ জনগণের মানবাধিকার সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। প্রতিদিন সিরিয়ায় বিদ্রোহী ও সৈন্যদের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা হচ্ছে। এতে করে সাধারণ মানুষের জীবন সেখানে বিপন্ন। সিরিয়ার আশপাশে অবস্থিত দেশসমূহ শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিরিয়ার যুদ্ধ সেখানকার মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ কেড়ে নিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার যে সংকটের সম্মুখীন তাঁর দৃষ্টান্ত ২০১৫ সালের ১৩ই নভেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে আততায়ীর হামলা। এ হামলায় নিহত হয়েছেন ১৩০ জন মানুষ। আহত হয়েছেন প্রায় ৩৬৮ জন, এর মধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন ৮০-৯৯ জন।[৭] এ হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএসআইএস। এ হামলা মানবাধিকার পরিপন্থী, মানবতাবাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া ২০১৬ সালের ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় একটি পুলিশ

একাডেমিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয়। এ হামলায় অন্তত ৬১ জন নিহত হয়েছে। এ হামলার দায়ও স্বীকার করেছে আইএস এবং পাকিস্তান তালেবান। ২০১৬ সালের ৮ আগস্ট কোয়েটায় একটি সরকারি হাসপাতালে জঙ্গি হামলা সংঘঠিত হয়। এতে নিহত হন ৭০ জন।[৮]

মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে মিয়ানমারেও। সেখানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিনিয়ত অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত আছে। অনেক ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর দেশটির সরকারের এই নির্যাতন দীর্ঘদিনের। সরকার তাদের সব ধরনের মৌলিক, মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, তাদের শিক্ষার, ধর্মকর্ম করার, বিয়ে করার কোনো অধিকার নেই। গত ৯ অক্টোবর ২০১৬ থেকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ প্রকাশিত স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবিতে দেখা গেছে যে, ২২ অক্টোবর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত রাখাইন রাজ্যের অনেক জায়গায় প্রায় ৮৩০টি বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।[৯] আন্তর্জাতিক মহলে মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় রাখাইনের উগ্র তরুণদের নিয়ে নাডালা নামক বাহিনী গঠন করা হয়েছে। ওই বাহিনীর মাধ্যমে এখনো হত্যা, ধর্ষণ অব্যাহত আছে। এই কারণে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আসা এখনো অব্যাহত আছে।[১০]

বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্ক অনেক পুরনো। কিন্তু সেখানকার রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বর্বরোচিত অত্যাচার হতে জীবন বাঁচাতে দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আসছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ মৌলবাদীরা রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় অব্যাহতভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে। মানবাধিকার বলে যদি কোন কিছু থেকে থাকে, তাহলে রোহিঙ্গাদের জীবনে তার লেশমাত্র নেই। রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন মিয়ানমারে আসে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে। তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে ৮৮টি সুপারিশ করা

হয়েছে। এর মধ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের চলাচলে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং নাগরিকত্ব প্রদান অন্যতম।

গত ২৫ আগস্ট (২০১৭) নবগঠিত 'আরসা' নামের রোহিঙ্গা ইনসারজেন্ট গ্রুপ কয়েকটি জায়গায় হামলা চালালে এর পর হতেই রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংস অভিযান শুরু হয়। রাখাইন থেকে প্রাণ বাঁচাতে ২৫ আগস্টের পর হতে এখন পর্যন্ত ৬ লাখ ২৬ হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে।[১১] কিন্তু মিয়ানমার বারবারই এই গণহত্যার, নির্যাতনের কথা অস্বীকার করছে। মিয়ানমারের এই প্রয়াসে সমর্থন জানিয়েছে চীন, ভারত এবং রাশিয়া কিন্তু এসব দেশ মিয়ানমারের পক্ষ নিলেও যুক্তরাষ্ট্র এই চলমান সংকটে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মিয়ানমার হতে যে বিপুলসংখ্যক লোকজনের বাংলাদেশে পালিয়ে আসাকে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে ভয়াবহ শরণার্থী সংকট বলে জাতিসংঘ মনে করছে। জাতিসংঘ বরাবরই মিয়ানমারের কার্যক্রমের নিন্দা করে আসছে। তাই আন্তর্জাতিক চাপের কারণে গত ২৩ নভেম্বর (২০১৭) সালে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি সইয়ের পরও বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আসা থামেনি।

শাসকগোষ্ঠী দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে সে বিষয় যদি জাতিসংঘ দপ্তরকে অবহিত করা হয় তবে জাতিসংঘ উক্ত দেশটির প্রতি হুঁশিয়ারি জানাতে পারে। এমনকি ইচ্ছা করলে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যেকোনো ধরণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। এমনকি মানবাধিকার রক্ষার তাগিদে জাতিসংঘ প্রয়োজনে শান্তিরক্ষী বাহিনীও প্রেরণ করতে পারে। মূলত ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক কেমন তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় সর্বজনীন মানবাধিকার

ঘোষণাপত্রে। সাধারণত মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব জাতিসংঘ রাষ্ট্রের হাতেই দিয়ে দিয়েছে। সেদিক থেকে রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো নাগরিকদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রেই তাদের নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে।

বিশ্বে মানবাধিকারের জন্য সন্ত্রাসবাদ হলো সবচেয়ে বড় হুমকি। সন্ত্রাসবাদের কারণে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হয়। ২০১৬ সালের ২২ মার্চ বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের জাভেনতেম বিমানবন্দর ও একটি মেট্রো স্টেশনে সন্ত্রাসী হামলা হয়। এ হামলায় অন্তত ৩৪ জন মানুষ নিহত হয়েছে।[১২] সন্ত্রাসবাদের কারণে বিশ্বে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। প্রতিটি মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। সন্ত্রাসবাদ মানুষের জীবনে অশান্তি বয়ে আনে। বেলজিয়ামের এই হামলার ফলে প্রায় দুই শতাধিক বেসামরিক নাগরিক আহত এবং ৩৪ জন মানুষ নিহত হয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদের কারণে মানুষ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। সন্ত্রাসবাদ অনৈতিক, কারণ তা মানুষের অধিকার হরণ করে।

বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের কাছে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা সংযোজিত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে"। অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক দেশের মূল চালিকা শক্তি হলো জনগণ। তাই জনগণের সকল ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব।

১৯৭২ সালের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এখানে জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪১ নং অনুচ্ছেদে মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, সমাবেশ করার অধিকার, সংগঠন করার স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলো মানুষের নৈতিক অধিকার। এসকল অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা অন্যায়। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে নানাভাবে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সুযোগের সমতা প্রসঙ্গেই প্রথমে আলোচনা করা যাক, সবসময়ই বলা হয় নারী ও পুরুষ সমান। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য বিদ্যমান নেই। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেক আগে থেকেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যেমন: কাজ করতে গিয়ে নারীরা ন্যায্য পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত হয়, সুযোগের সমতার অধিকার পায় না। নারীদের অনেক বুদ্ধিদীপ্ত কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। এমন অনেক পরিবার আছে যারা মেয়েদের শিক্ষালাভের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে না। তারা মনে করে ছেলে শিক্ষিত হলেই হলো, তাদের বদ্ধমূল ধারণা হলো মেয়েদের কাজ হলো সংসার করা ও সন্তান পালন করা। কিন্তু ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যেমন বাল্যবিবাহের কথাই ধরা যাক, মেয়েদের ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক জায়গায়ই মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়। গত ৩০ নভেম্বর ২০১৬ প্রথম আলো পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, বিয়ের জন্য চাপের কারণে শরীয়তপুর সদর উপজেলার মধ্যপাড়া গ্রামের ৫ম শ্রেণীর এক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।[১৩]

তাই মানবাধিকার রক্ষা করতে হলে নারী ও পুরুষের সুযোগ লাভের মধ্যে অবশ্যই সমতা রক্ষা করতে হবে। কারণ একজন নারীও মানুষ। মানুষ হিসেবে তারও সকল সুযোগ সুবিধা লাভের অধিকার আছে। এই অধিকার হতে কাউকে বঞ্চিত করা অন্যায়ের সামিল। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদে কোনো নাগরিকের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রদর্শন করা যাবে না। ১৯ নং অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে সকলের জন্য সুযোগের সমতা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু এ বিষয়টির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগের সমতার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন: বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়,এর প্রায় ৮৫% শ্রমিকই হলো নারী। যাদের পারিশ্রমিক অনেক কম। যা তাদের সংসার চালানোর জন্য খুবই সামান্য।[১৪]

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। একটি রাষ্ট্রের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ হলো তার জনগণ। একটি রাষ্ট্র তখনই সফল রাষ্ট্র হয় যখন প্রতিটি নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। বাংলাদেশে ২০১৫ সালে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসেছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। ২০১৫ সালে সেক্যুলার ব্লগার ও বিদেশী ত্রাণকর্মীদের নিশানা বানিয়েছে কট্টরপন্থীরা।[১৫]

বাংলাদেশে মানবাধিকার থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হলো নারী সমাজ। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। বেশিরভাগ সময়ই মেয়েরা নিরাপত্তার অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে চায় না। বাংলাদেশে

এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে বিদ্যালয়গুলো বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দূরে হওয়ায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ার কারণে অনেক পরিবার তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। এছাড়াও রাস্তায় বখাটেদের উৎপাত, ইভটিজিং ইত্যাদিও মেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠানোর অন্যতম কারণ।

মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো বাল্যবিবাহ। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলগুলোতে বাল্যবিবাহ একটি প্রচলিত রীতি। "ইউনিসেফের মতে ১৮ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের শিকার ৬৬% এবং ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার ৩২%"।[১৬] অন্যদিকে ২০১৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বাল্যবিবাহের ওপর যে জরিপ চালানো হয় তাতে বলা হয়, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৬৪%।[১৭] বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা বাস্তব পরিস্থিতি সহজে বুঝে উঠতে পারে না। কারণ মেয়েটি নিজেই তো অপ্রাপ্তবয়স্ক। বাংলাদেশে অনেক জায়গায়ই প্রতিনিয়ত বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন জোর পদক্ষেপ তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছরই থাকছে। কিন্তু বিশেষ ধারায়, বিশেষক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো মেয়ের বিয়ে হলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এতে বাল্যবিবাহের হার হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পাবে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা কোনো নতুন বিষয় নয়। প্রতিদিন অনেক নারীই বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো নারীর নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণের, আহত হবার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। নারীর অধিকারসমূহ প্রতি মুহূর্তেই সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় যৌতুকের কারণে নারীর ওপর অত্যাচার, নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যৌতুক না পেয়ে অনেক সময় গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। নারীরাই সবসময় দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

বর্তমানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও নারীর অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। যেমন: মানবাধিকার কমিশন, নারীর অধিকার রক্ষায় গঠিত বিভিন্ন পরিষদ। নারীকে উন্নয়নের শিখরে নিতে ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীর ওপর সকল প্রকার বৈষম্য ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘের স্পেশাল রেপোর্টিয়ার অন VAW এর রিপোর্ট ২০০৭ এর প্রতিবেদন মতে, "নারীর মানবাধিকার, নির্যাতন ও নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের বিষয়গুলো বিবেচনা সহকারে দেখা হচ্ছে"।

১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকোতে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে তার উদ্যোগ মূলত এই সম্মেলনের মাধ্যমেই অনেকাংশে তরান্বিত হয়। জাতিসংঘ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ১৯৭৫ সালকে "নারী বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে "নারী দশক" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহেগেনে ১৯৮০ সালে। এতে নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি ও কার্যক্রম বিবেচনা করা হয় এবং নারী দশকের উদ্দেশ্যের মধ্যে আরো ৩টি বিষয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানকে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৫ সালে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবীতে। পর্যায়ক্রমে ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেইজিং সম্মেলনে নারীর উন্নয়নে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। এসকল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশও অঙ্গীকারবদ্ধ। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ গৃহীত এবং ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তা কার্যকর হয়।

বাংলাদেশে নারী ও শিশুকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, যৌতুক নিরোধ আইন ইত্যাদি। নারী আন্দোলনও ১৯৮০ সাল থেকে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করছে নারী নির্যাতন বন্ধ করার।

সকলের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি শিশু অধিকার রক্ষা করাও প্রতিটি সচেতন ব্যক্তির দায়িত্ব। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ যে ২২টি দেশ প্রথমে সমর্থন করেছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার আজ লঙ্ঘিত হচ্ছে। শিশুরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও প্রথম আলোর জরিপ অনুযায়ী ২০১২-২০১৬ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত শিশু হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ১১৩৪টি।[১৮] ২০১৫ সালের ৮ জুলাই সিলেটের রাজন হত্যাকাণ্ড এবং একই বছর ৮ আগস্ট খুলনায় রাকিব হত্যাকাণ্ড শিশু নির্যাতনের অমানবিকতার দৃষ্টান্ত।[১৯] শিশুদের অধিকার রক্ষা করা প্রতিটি সচেতন মানুষের দায়িত্ব। বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার রক্ষায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে মানবাধিকার বিপুল মাত্রায় সংকটের সম্মুখীন হয়। ২০১৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৩ সালের শেষের দিকে যেসকল হরতাল, অবরোধ দেয়া হয় তাতে পেট্রোল বোমা হামলায় অনেক মানুষ হতাহত এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। পরবর্তীতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানি, সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন, এসব অগণতান্ত্রিক ও আইনের শাসন পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশে নৃশংস একটি ঘটনা ঘটে। এই দিন গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গীদের হামলায় মৃত্যুবরণ করে দেশী-বিদেশী কর্মচারী, পুলিশ ও হামলাকারীসহ মোট ২৯ জন।[২০] প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে এ হামলার পিছনে দায়ী নব্য জেএমবি। এ হামলার মাধ্যমে মানবতাবাদের বিপর্যয় ঘটেছে। যেখানে মানবাধিকার রক্ষায় আজ পুরো বিশ্ব সোচ্চার, সেখানে বাংলাদেশে সংঘঠিত ঘটনাটি মানবাধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ।

মানবাধিকার ঘোষণায় মোট ত্রিশটি ধারা রয়েছে। যাতে জীবনের কোনো ক্ষেত্রও বাদ যায়নি। প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণ, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। মানবাধিকার ঘোষণার অনেকগুলো ধারায় বাধা-নিষেধহীন মুক্ত জীবনের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমাজের প্রয়োজনে মানুষকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু বিনা কারণে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে না, তাও বলা আছে ধারাসমূহে। অর্থাৎ কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকতে হবে। মিথ্যা অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করলে তা আইনের দৃষ্টিতে ঘৃণীত অপরাধ বলে গণ্য হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রশাসন বিভাগের প্রভাব বিচার বিভাগে থাকলে সেখানে বিচার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ন্যায়বিচার পেতে হলে বিচারবিভাগকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে যে, বিনা কারণে কখনো কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যায় এখানে বিনা কারণে অনেক মানুষকে গ্রেফতার করে হয়রানি করা হচ্ছে। এতে করে মানবাধিকার রক্ষার পরিবর্তে লঙ্ঘনই বেশি হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বিনা অপরাধে মানুষকে গ্রেফতার ও মানুষের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে।

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) সংস্থাটি দেশের জনগণের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় হত্যা, খুন, গুমের মতো মানবতাবিরোধী ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। রানা প্লাজার মালিক গ্রেফতার, জঙ্গি ও সন্ত্রাসী গ্রেফতারসহ বেশকিছু কাজের জন্য সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আস্থা অর্জন করেছে। কিন্তু বহু হত্যা, খুন ও গুমের ঘটনার কোনো কুলকিনারা হয়নি। কোনো কোনো সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু কিছু সদস্যের বেআইনি কর্মকাণ্ড ও ব্যর্থতায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর মানুষ আস্থা হারায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা বন্দুকযুদ্ধ, ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যার কারণে বছরের পর বছর মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতনের কারণে স্থায়ী পঙ্গুত্ববরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু কয়েকটি ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থরা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

এখনো এমন অনেক মানুষের খোঁজ পাওয়া যায়নি, যাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ঘটনায় নিখোঁজ বা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা ডিবি, র‍্যাব ও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসন থেকে কোনো প্রকার আইনগত ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার ফলে জনগণের মধ্যে অসহিষ্ণুতা মনোভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন: গণপিটুনি। অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেলে আইন হাতে তুলে নিতে মানুষ বাধ্য হয়, যা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক। বর্তমানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অনেক বড় একটি বিষয়

হলো মানব পাচার। এখন পর্যন্ত সাগর পথে, ট্রলারে অভিবাসন প্রত্যাশী অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। অভিবাসনের কথা বলে অনেক মানুষকে নিয়ে বন্দি করে মুক্তিপণ চাওয়া হয়। মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হলে মানুষকে মেরেও ফেলা হয়।

বাংলাদেশের অনেক জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো হয়। যেমন: ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুতে ১২টি বৌদ্ধ মন্দির ও ৫০টি ঘরবাড়ি ভাঙ্গচুর করা হয়।[২১] এখনো বাংলাদেশের অনেক জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, হত্যা,নির্যাতন চলছে। ২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর রোববার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় ১৫টি মন্দির ও শতাধিক বাড়িঘর ভাঙ্গচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার জের ধরেই হবিগঞ্জের মাধবপুরেও ২টি মন্দির এবং কিছু বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটে।[২২] সম্প্রতি পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে এক মঠপ্রধানকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও নাটোরের বড়াইগ্রামে খ্রিস্টান দম্পতির উপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা। এসব ঘটনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। অথচ সংবিধানের রক্ষক রাষ্ট্র ও সরকার সংখ্যালঘুদের জীবনের নিরাপত্তা ও ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে প্রতিনিয়ত বিএসএফের গুলিতে অনেক বাংলাদেশী নিহত হচ্ছে, যা সব সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। গত দশ বছরে সীমান্তে হাজারখানেক বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। মানবাধিকারের চরম বিপর্যয় এখানে লক্ষ্য করা যায়। সীমান্তে মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার দায়িত্ব ভারত, বাংলাদেশ উভয়েরই। উভয় দেশই এ নৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

মানবাধিকার কোনো ব্যক্তির একার বিষয় নয়। এটি প্রতিটি মানুষের নৈতিক অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মানবাধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে থাকে। এ আইনসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাধারণ জনগণের মানবাধিকার রক্ষা করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মানুষের মানবাধিকার সংরক্ষণ না করে বরং কেড়ে নিচ্ছে। পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন হয়। যেমন: ২০০১ সালে ৭৪ জন এবং ২০০২ সালে মোট ১৭৭ জনের মৃত্যু হয়।[২৩]

পুরো বিশ্বেই আজ মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন। যেমন: গত ২০১৬ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সের অবকাশ যাপন শহর নিসে এক দুর্বৃত্তের ট্রাকের চাপায় প্রাণ হারায় ৮৪ জন এবং আহত হয় ১৮৮ জন।[২৪] তুরস্কে সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হলে এতে ১০৪ জন সেনাসহ নিহত হয় ২৬৫ জন। সাধারণ জনগণের চেষ্টায় সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়।[২৫]

প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই তার স্বাধীনতা, অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাহলে মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। যুদ্ধ, নির্যাতন, অত্যাচার, সন্ত্রাস এসবই মানবাধিকারের শত্রু এবং শান্তি ভঙ্গকারী। তাই মানুষের জীবনের শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকার সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। নৈতিক অধিকার হিসেবে মানবাধিকার সংরক্ষণ মানুষের নৈতিক দাবি।

Z_¨wb‡'k

১. হামাস মূলত প্যালেস্টাইনের সুন্নী ইসলামিক একটি সংগঠন। সংগঠনটি ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। হামাসের মিলিটারী শাখা হতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

২. Israel-Gaza Conflict, *Wikipedia*, Retrieved, 11 January, 2016.

৩. September attacks 11, *Wikipedia*, Retrieved, 12 February, 2016.

৪. September attacks 11, *Wikipedia*, Retrieved, 12 February, 2016.

৫. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, Retrieved, 26 March, 2016.

৬. c_g Av‡jv, বৃহস্পতিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ঢাকা, ২০১৬।

৭. Paris attacks, *Wikipedia*,Retrieved, 30 November, 2015.

৮. c_g Av‡jv, বুধবার, ২৬ অক্টোবর, ঢাকা, ২০১৬।

৯. c_g Av‡jv, বুধবার, ২৩ নভেম্বর, ঢাকা, ২০১৬।

১০.c_g Av‡jv, শুক্রবার, ৩০ ডিসেম্বর, ঢাকা, ২০১৬।

১১.c_g Av‡jv, বুধবার, ০৬ ডিসেম্বর, ঢাকা, ২০১৭।

১২.c_g Av‡jv, বুধবার, ২৩ মার্চ, ঢাকা, ২০১৬।

১৩.c_g Av‡jv, বুধবার, ৩০ নভেম্বর, ঢাকা, ২০১৬।

১৪.*Fighting Global Poverty-Sweatshops In Bangladesh*, War on Want, Retrieved, 30 December, 2016.

১৫.c_g Av‡jv, বৃহস্পতিবার, ২৮ জানুয়ারি, ঢাকা, ২০১৬।

১৬.*Wikipedia*, Retrieved, 27 February, 2016.

১৭. cø¨vb B›Uvib¨vkbvj I *ICDDRB* cwiPvwjZ Rwic, ২০১৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত।

১৮. evsjv‡‘k wkï AwaKvi †dvivg I c_g Av‡jv, ১ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত জরিপ অনুযায়ী।

১৯. Rajon, Rakib Murder Cases, *New Age,* Retrieved,31 December, 2016.

২০. c_g Av‡jv, রোববার, ৩ জুলাই, ঢাকা, ২০১৬।

২১.*Wikipedia, The Free Encyclopedia,* Retrieved, 16 March, 2016.

22.c_g Av‡jv, সোমবার, ৩১ অক্টোবর, ঢাকা, ২০১৬।

২৩.মিয়া মুহম্মদ সেলিম ও ডঃ লুৎফর রহমান, gvbewaKvi-mvgwRK b¨vqwePvi I mgvRKj¨vY, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩০৯।

24.c_g Av‡jv, শনিবার, ১৬ জুলাই, ঢাকা, ২০১৬।

25.c_g Av‡jv, রোববার, ১৭ জুলাই, ঢাকা, ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

Dhaka University Institutional Repository

4_ Aa¨vq

evsjv‡`‡k gvbevwaKv‡ii cwiw¯wZ I Gi KvhKwiZv

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের নীতিগত দাবি, যা মানুষের নৈতিকতার সাথে জড়িত। এ দাবি হতে যখন মানুষকে বঞ্চিত করা হয়, তখনই মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়। প্রতিটি দেশের সংবিধান সে দেশের ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার, স্বাধীনতা, ও ন্যায়বিচারের কথা লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশে সংবিধানের প্রস্তাবনায় আছে যে, 'রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক মানবাধিকার, সাম্য, সুবিচার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে'।[১] বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ২য় ও ৩য় ভাগের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে মানুষের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন, ২য় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতিগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মৌলিক মানবাধিকারের আলোচনা করা হয়েছে সংবিধানের ৩য় ভাগে। বাংলাদেশে মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কথা বলা হলেও এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটছে। বিভিন্নভাবে এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। যেমন: নারী নির্যাতন, সীমান্ত সংঘাত, শিশু নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, খুন, হত্যা ইত্যাদি।

সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন নির্যাতন বলা হয় ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের উপর পাক্ হানাদার বাহিনীর পরিচালিত অত্যাচারকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস হলো অন্যতম দীর্ঘ ত্যাগের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে

বাংলাদেশের জনগণের উপর যে নির্যাতন চালানো হয় তা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল ঘটনা। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা, মানুষের উপর নিপীড়ন, নারীদের ধর্ষণ ইত্যাদি, যা ইতোপূর্বে সকল নির্যাতনের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। এই নির্যাতনকে ইতিহাসের অন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বলা হয়।

বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের ঘটনা কোনো নতুন বিষয় নয়। এখানে নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। এ বৈষম্য থেকে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। একটি প্রগতিশীল সমাজের চিত্র তখনই ফুটে ওঠে যখন সকলের অধিকার সঠিকভাবে স্বীকৃত হয়। কার্ল মার্কসের মতে, মানুষের সকল অধিকার অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের অন্যান্য অধিকার পরিপূর্ণতা পায় অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল তার *Essays on Liberty* গ্রন্থে প্রত্যেক ব্যক্তির সার্বভৌম ক্ষমতাকে সমর্থন করেছেন।[২] তাই পুরুষের সমপর্যায়ের মর্যাদা পাওয়ার অধিকার নারীরও রয়েছে।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণভাবে নারীরা অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। সমগ্র বিশ্বের নারীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৯ সালে ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন করে। নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা বন্ধ করার জন্য এই সনদ প্রণীত হয়। সনদটি CEDAW ("Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women") নামে পরিচিত।[৩] নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে CEDAW তে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর CEDAW সনদটি অনুমোদন করে। বাংলাদেশে নারীর অধিকার

পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় বস্তুগত বিচারে পারিবারিক আইনগুলো বৈষম্যমূলক। এ আইনগুলোতে নারীর অধিকার রক্ষার পরিবর্তে ক্ষুন্ন হয়েছে।

একথা সবসময় বলা হয় নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের যথাযথ মূল্যায়নই করা হয় না। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। বৈষম্যের বিষয়টি বেশি দেখা যায় গ্রাম অঞ্চলে । এখনো এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যারা মনে করেন মেয়েদের শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা মনে করেন, মেয়েরা হলো একরকম বোঝা। মেয়েদের শিক্ষিত করে কোনো লাভ নেই। বরং তারা ছেলেদের এতটা গুরুত্ব দেন যে, তাদের বিশ্বাস একটি ছেলে পরিবারের জন্য যা করতে পারে একটি মেয়ে তা পারে না। এতে করে কেবলমাত্র মেয়ে হিসেবে জন্মানোর কারণে আজ অনেক নারী তার ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কি বিপুল মাত্রায় আমাদের দেশে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেখানে একটি মেয়েকে শৈশব থেকেই অনেক কষ্ট করে বড় হতে হয়। এরপর যখন তাঁর বিয়ে হয় তখন সে যৌতুকের কারণে স্বামীর বাড়িতে গিয়েও নির্যাতনের শিকার হয়। নারী নির্যাতনের হার নির্ণয়ের জন্য ব্র্যাক দেশের ৫৫টি জেলায় নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে জরিপ চালিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তাতে বলা হয় ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২,৮৭৩টি পরের বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫০০৮টি।[৪] পুরো পৃথিবীর দিকে নজর দিলে দেখা যায় বিশ্বে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা কোনো নতুন বিষয় নয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও নারীর অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও নারী নির্যাতনের হার কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

আসক এর প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পারিবারিক নির্যাতনের শিকার নারীর সংখ্যা ৩৯৪ জন, যৌতুকের কারণে শারীরিকভাবে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১০৮ জন এবং ১২৬ জন নারীকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে।[৫]

২০১৬ সালের ২০ মার্চ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনুকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। তনু হত্যার বিচারের দাবিতে আজ পুরো দেশ উত্তাল। অনেকগুলো মানবাধিকার সংস্থা তনু হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তনু হত্যার বিচার দাবি করেছে। নারীর মানবাধিকার রক্ষায় সকলকে এভাবে সচেতন হতে হবে।

২৮ আগস্ট ২০১৪ সালের এক জরিপে দেখা গেছে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নারীর ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৮৮টি। আবার ২০১২ সালের জানুয়ারি হতে নভেম্বর পর্যন্ত এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৯৭টি।[৬] বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ২০১৫ সালের যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় ২০১৫ সালে এসিডদগ্ধ নারীর সংখ্যা ৩৭ জন।[৭] এ ঘটনাসমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে নারীর জন্য নিরাপত্তা কতটা জরুরী। বাংলাদেশে অনেক জায়গায় বখাটেদের কু-প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় অনেক মেয়েকে এসিড নিক্ষেপের শিকার হতে হয়েছে। বাংলাদেশে নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপের হার হলো শতকরা ১০.২%। নারীর অধিকার রক্ষা করতে হলে এসকল বর্বরোচিত ঘটনার অবসান ঘটাতে হবে। নারী যে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে নারীর যেসকল ন্যায্য অধিকারসমূহ রয়েছে, তা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় আনলে দেখা যায় একজন নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করায় তাকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সম্প্রতি ২০১৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে প্রথম আলো, ইউএন উইমেন এবং সুইডেন দূতাবাস আয়োজন করে "নারীর পক্ষে পুরুষ" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। এ বৈঠকে মূলত গুরুত্বারোপ করা হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে সরকারি জরিপে দেখা গেছে, বিবাহিত ১০ জন নারীর মধ্যে প্রায় ৯ জনই স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার। আলোচনায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উপস্থিত ছিলেন। তিনি মনে করেন নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য বাল্যবিবাহ হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মেয়েদের বিয়ের বয়স কমানোর প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে রবার্ট ডি ওয়াটকিন্স উদ্বেগ প্রকাশ করেন। "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের ১০ই জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১১ সালে "ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১" জরিপের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশে নারী নির্যাতনের হার শতকরা ৮৭ শতাংশ"[৮]। বর্তমানে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছরই থাকছে। কিন্তু 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬' আইনের খসড়ায় বিশেষ ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো মেয়ের বিয়ে হলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না।[৯] গোলটেবিল বৈঠকগুলোতে মূলত আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর গুরুতারোপ করা হয়। অর্থাৎ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগ অপরিহার্য। এ আইনসমূহ যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে নারী নির্যাতন অনেকাংশে রোধ করা যাবে। প্রাপ্ত বিভিন্ন জরিপ ও তথ্যের আলোকে দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ১০-২০ হাজার নারী বিদেশে পাচার করা হয়।[১০] এই বিপুল সংখ্যক নারীর দুর্ভাগ্যই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে বাংলাদেশে নারী অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশে নারীর অধিকারকে অবজ্ঞা করার একটি অন্যতম বিষয় হলো ফতোয়া। ফতোয়ার মাধ্যমে অসংখ্য নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অনেক সময় কিছু নারী স্বাধীনভাবে কোনো পুরুষকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিলে শরীয়তের দোহাই দিয়ে এর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করা হয়। এজন্য কঠিন শাস্তিও প্রদান করা হয়। যেমন: সিলেটের কমলগঞ্জ ছাতকছড়া গ্রামের গ্রাম্য সালিশে ফতোয়া অনুযায়ী বিচারে নূরজাহান বেগম

নামক এক নারীকে কয়েক ফুট মাটিতে পুঁতে তাঁর গায়ে ১০১টি পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর পিতামাতাকেও ৫০টি দোররা মারা হয়। এই অপমান সইতে না পেরে নূরজাহান বেগম আত্মহত্যা করে। কিন্তু সকল প্রকার ফতোয়া রাষ্ট্রীয় আইন বহির্ভূত এবং বেআইনি। ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতনের ঘটনা অনেক পূর্ব হতে চলে আসছে। ২০০১ সালে এর সংখ্যা ছিল ৩৪টি। ২০০০ সালে ছিল ৩১টি। বিশেষ করে গ্রামের নিরীহ, গরিব ও অসহায় নারীরাই ফতোয়াবাজির শিকার হয়ে থাকে। ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের জুলাই পর্যন্ত আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর তথ্য মতে, ফতোয়ার কারণে নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে ১৮৬টি।[১১]

বাংলাদেশে বর্তমানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে শিশুরা। অধিকার লাভ করা প্রতিটি শিশুর ন্যায্য দাবি। কিন্তু এখন দেশের অনেক জায়গায় বিনা কারণে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশু অধিকার পরিস্থিতি মোটেও অনুকূলে নয়। প্রতিটি শিশুই হলো জাতির ভবিষ্যৎ। জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন শিশুদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা এবং তাদের নৈতিক অধিকার রক্ষা করা। কিন্তু বাংলাদেশসহ বিশ্বের কতিপয় দেশে শিশু নির্যাতনের বিষয়টি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার পরিবেশ দেওয়া এবং শিশুদের শিশুশ্রম থেকে বিরত রাখা উচিৎ। অথচ বাংলাদেশে শিশুশ্রম অবাধে চলছে। শিশুশ্রম শিশুদের অধিকার পূরণে বাধার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে শিশুর অধিকারসমূহ আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন, শিশুশ্রম বন্ধে আইন প্রণয়ন করা হলেও তার কোনো বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না।

বিশ্বের সকল শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ১৯০০ সালে। শিশুদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশন্স জেনেভা ঘোষণা বা Geneva Declaration of the rights of the child-1924 গ্রহণ করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিশুদের অধিকার রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ প্রণীত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের মাধ্যমে শিশুর অধিকার কনভেনশন আন্তর্জাতিক আইনে পরিণতি লাভ করে ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদটি যে ২২টি দেশ প্রথম সমর্থন করেছিল, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। এই সনদটির বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য হয়েছে ১৯৯১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে। কিন্তু এতো আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ বাংলাদেশে তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সসীমা নিয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু জাতীয় শিশু নীতিতে ১৪ বছরের কম বয়সের সকলকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এতো আলোচনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিশুরা প্রতিনিয়ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পারিবারিক প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে অনেক শিশুকেই শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য করা হয়, বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের জরিপ মতে, দেশের মোট শ্রমিকের প্রায় ১২% হলো শিশু শ্রমিক।[১২] দেশের প্রচলিত আইনে শিশুদের জন্য শ্রম নিষিদ্ধ হলেও পারিবারিক প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে অনেক শিশুকেই শ্রমে নিয়োজিত হতে হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে দেশে শিশু হত্যার হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা শিশু অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ। গত পাঁচ বছরে অর্থাৎ ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ১১৩৪ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।[১৩] বর্তমানে পারিবারিক কলহ, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্য হিসেবে শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে আইন থাকলেও তাঁর প্রয়োগ তেমন ফলপ্রসূ নয়। সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধকে কেন্দ্র করে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় সুন্দ্রাটিকি গ্রামের ৪ জন শিশুকে হত্যা করা হয়।[১৪] এ ধরনের বিচারহীনতা সমাজে শিশুদের অসহায় অবস্থার চিত্রই ফুটিয়ে তুলছে।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের আইনগত অধিকার। বাংলাদেশে মানবাধিকারকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি যেমন প্রণয়ন করা হয়েছে তেমনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটছে। বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমেও অনেক সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় ব্যক্তির মৃত্যু কোনো বিরল ঘটনা নয়। ধীরে ধীরে এসব ঘটনার পরিমাণ কমার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে মানবাধিকার সংরক্ষিত না হয়ে লঙ্ঘিত হচ্ছে। যেমন, প্রমাণ পাওয়া গেছে যে কারা হেফাজতে ও পুলিশী হেফাজতে ২০০১ সালে দণ্ডপ্রাপ্ত ২৪ জন, এবং বিচারাধীন ৫০ জনের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে ২০০২ সালে মোট ১৭৭ জনের মৃত্যু হয়।[১৫]

প্রায়ই শোনা যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বিনা কারণে যে কাউকেই গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, যে কাউকেই খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না। কিন্তু এমন ঘটনায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এছাড়াও বাংলাদেশের র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব) ও পুলিশ বিভিন্ন বিচারবহির্ভূত হত্যার সাথে জড়িত রয়েছে। এসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে ক্রসফায়ার বলে তারা আইনি বৈধতা দেয়ার চেষ্টা

করে। যেমন: নারায়নগঞ্জের সাত খুন। নারায়নগঞ্জের সাত খুনের সাথে র‍্যাবের সদস্যরা জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় ১৬ জন র‍্যাব সদস্যকে সাসপেণ্ড করা হয়। পরবর্তীতে তাদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক বড় একটি ক্ষেত্র হলো সীমান্ত সমস্যা। সীমান্তে যেসকল সমস্যা রয়েছে, তাঁর বেশির ভাগই খবরে প্রকাশ করা হয় না। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার প্রায় ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত সীমাকে পৃথিবীর অন্যতম রক্তাক্ত সীমান্ত বলে মনে করা হয়। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, বিএসএফ(বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) এর হাতে ১০ বছরে হাজার খানেক মানুষ খুন হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় প্রতি চার দিনে একজন করে মানুষ খুন হয়েছে।[১৬]১৯৯৩ সালে ৩ হাজার ২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সীমান্ত দেয়াল তুলতে শুরু করে ভারত। এই সীমান্ত দেয়াল অন্যতম রক্তাক্ত ও ভয়ংকর দেয়াল বলে পরিচিত। এর প্রধান শিকার হলো বাংলাদেশের মানুষ। গত ১০ বছরে সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই সীমান্তে প্রতি পাঁচ দিনে একজন করে মানুষের প্রাণ গেছে।[১৭]

হত্যা, নির্যাতন, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হিংস্র আচরণসহ বহু অভিযোগ আছে বিএসএফ এর বিরুদ্ধে। এর বেশিরভাগ শিকার বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষ। ভারতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী সবসময়ই হিংস্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফেলানী হত্যাকাণ্ড এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। ফেলানী খাতুন বিএসএফের নিষ্ঠুরতা হতে রক্ষা পাননি। কাঁটাতারের বেড়া টপকাতে গিয়ে ফেলানীর কামিজ কাঁটাতারে আটকে যায়। ফেলানীর প্রতি ভারতের সীমান্ত প্রহরীরা দয়া না দেখিয়ে বরং তাকে গুলি করে। ফেলানীর মৃতদেহ কাঁটাতারে পরদিন সকাল পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তারপর মৃত পশুর মত বাঁশে হাত-পা বেঁধে ফেলানীর মৃতদেহ বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৮] এই খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার এই

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ভারত সরকারকে তদন্ত করতে বাধ্য করে। কিন্তু ফেলানীকে গুলি করা বিএসএফ প্রহরীদের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়া হয়। এখনো সেই প্রহরীরা বহাল তবিয়তে কাজ করছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ দ্বারা অনেক হত্যা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু বেশিরভাগ অপরাধেরই কোনো বিচার হয় না। সীমান্ত এলাকায় প্রতিনিয়ত যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা সমাধানের জন্য কোনো কঠোর পদক্ষেপ এখনো নেওয়া হচ্ছে না।

রাষ্ট্র তার জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত পাহারা দেবে, সীমান্তে বেড়াও স্থাপন করবে। কিন্তু সীমান্তের মানুষের অধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অথচ আজ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্য জায়গাগুলোতেও সীমান্তে মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মতো এত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর সীমান্ত আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। প্রতিনিয়ত এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য কোনো সঠিক ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

একটি রাষ্ট্রের কাছে প্রতিটি নাগরিকই সমান। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার যাতে সংরক্ষিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার যখন সংকটের সম্মুখীন হয় তখনই মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। অনেক স্থানে মন্দির এবং ঘরবাড়িতে হামলা ও ভাঙ্গচুরও চালানো হয়। যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের রামু উপজেলায় বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের উপর দুর্বৃত্তরা অতর্কিত হামলা চালায়। দুর্বৃত্তদের হামলায় এখানে ১২টি মন্দির ও প্রায় ৫০টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১৯] ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর হতে ২০১৬ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে দুই বিদেশী নাগরিক হত্যা,

একাধিক খ্রিস্টান পাদ্রিকে হত্যার চেষ্টা, খ্রিস্টান দম্পতির ওপর হামলা, হিন্দু মঠের অধ্যক্ষকে হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশে মানবাধিকার যে সংকটের সম্মুখীন এসব ঘটনা থেকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এবার শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। আধুনিক অর্থনীতির মূল কথাই হলো পুঁজি ও শ্রম। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় স্বল্প মূল্যে শ্রম ক্রয় করার মূল লক্ষ্যই হলো অধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা এবং শ্রমিক শোষণ করা। শিল্প বিপ্লবের পর বিশ্বে অভিনব কায়দায় শ্রমিক শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক শোষণ বন্ধের জন্য এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মহুতি দিয়েছে অনেক শ্রমিক। এত ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অধিকার পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সময়ে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রেও শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত আছে। এ যুগে উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তিই হলো শ্রমিক। তাই শ্রমিকদের নিকট হতে দক্ষতাসম্পন্ন শ্রম পেতে হলে অবশ্যই শ্রমিকদের অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

শিল্পের উন্নয়নের সাথে শ্রমিক শোষণও জড়িত। শ্রমিকদের শোষণ করে পুঁজিপতিরা পুঁজির পাহাড় গড়েছে। তাই শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময়ে অনেক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। আন্দোলনের ফলস্বরূপ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন দেশে তৈরি হয়েছে অনেক আইন। শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। শ্রমিক অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে (আইএলও) প্রণয়ন করেছে একগুচ্ছ আন্তর্জাতিক শ্রম আইন। জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র এই আন্তর্জাতিক শ্রম আইনসমূহ মানতে বাধ্য। (আইএলও) শ্রমিক শ্রেণীর মানবাধিকারের কতিপয় মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে। যেমন : আট ঘন্টার কাজের অধিকার,

বিশ্রামের অধিকার, ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তির অধিকার, নিরাপদ কর্ম পরিবেশের অধিকার, নিয়োগপত্র প্রাপ্তির অধিকার, শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার ইত্যাদি।

১৯৯৮ সালের প্রবর্তিত আইএলও এর কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার বিষয়ক ঘোষণার শর্ত মেনে চলার জন্য বাংলাদেশও দায়বদ্ধ। বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের মাত্র ১২-১৩% আসে শিল্প হতে। বর্তমানে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি বড় অংশ আসে গার্মেন্টস শিল্প হতে। শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ শ্রমিক গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। এজন্য শ্রমিক শোষণ ও বঞ্চনার হারও অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া আইএলও ঘোষিত নিয়মনীতিগুলো বাংলাদেশের গার্মেন্টসগুলোতে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করা হয়। বর্তমানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৯৫% পরিচয় পত্র পাচ্ছেন। কিন্তু এই পরিচয়পত্র একজন শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তেমন কোন ভূমিকা পালন করে না। বাংলাদেশের শিল্পখাতে শ্রমিকদের অধিকার নামেমাত্র সংরক্ষণ করা হয়। জরিপের আলোকে দেখা যায় শ্রমিকদের মধ্যে নারী-পুরুষভেদেও বৈষম্য করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও নেই। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা নামক ভবনটি ধ্বসে পড়ে। সেখানে কয়েকটি গার্মেন্টস ছিল। ভবন ধ্বসে প্রায় ১,১২৯ জন নিহত হয়, আহত হয় প্রায় ২৫০০ জন।[২০] রানা প্লাজায় গার্মেন্টস কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। রানা প্লাজা ধ্বসকে কেন্দ্র করে অনেক শ্রমিক নিহত হওয়ায় বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা উঠে আসে, যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা রহিত করে। শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই সকলকে সচেতন হতে হবে। এছাড়াও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

মানবাধিকার যেমন লঙ্ঘিত হচ্ছে তেমনি মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য আবার বিভিন্ন সংস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশেও মানবাধিকার রক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলো কাজ করছে। সভ্যতার প্রথম থেকেই মানবকল্যাণে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি কাজ করে যাচ্ছে। সেসকল গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মহতি প্রচেষ্ঠার সাংগঠনিক রূপই হলো আজকের বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও-এর কার্যক্রম। এনজিও বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা জনস্বার্থে সেবা প্রদান করে থাকে। এনজিওগুলো মূলত জনসাধারণের পক্ষে সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে। এদের সাথে সরকারের কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় না। এনজিওর প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞাটি লিপিবদ্ধ আছে Encyclopedia of public international Law র vol-9,1986, p-270 তে। এনজিওর মধ্যেও পার্থক্য আছে। জাতীয় এনজিও বলতে সেসকল এনজিওকে বোঝায় যাদের কাজ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার, যেসকল বেসরকারি সংস্থার কাজ দেশের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাদের বলা হয় আন্তর্জাতিক এনজিও।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংরক্ষণের অন্যতম সংস্থা হলো বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন। দেশের নাগরিকদের আইনের প্রতি সচেতন করে গড়ে তোলার জন্য এই সংস্থা অনেকদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করেই এই সংস্থাটি কাজ পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রতারণা, অসহায় ও নির্যাতনের শিকার মানুষদের আইনি সহায়তা প্রদান। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন যাত্রা শুরু করে ১৯৮৬ সালে। মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকার তথ্যানুযায়ী (২০০৪ জুন), এ সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার অধিকার বঞ্চিত ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষদের সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য এনজিওগুলোর মধ্যে 'The Institute of Democratic Rights' উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে ১৯৮৩ সালে 'The Institute of Democratic Rights' (IDR) গঠিত হওয়ার পর হতে দেশের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র শ্রেণীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। এ সংস্থাটি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্যগুলোকে নিজের মধ্যে সমুন্নত রেখেছে।

বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত নির্যাতন রোধে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি'। শিশু ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, যৌন হয়রানী, এসিড সন্ত্রাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমিতি বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশুরা হলো জাতির অমূল্য সম্পদ। কিন্তু বাংলাদেশে শিশুরাই বেশি অধিকার বঞ্চিত। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিভিন্ন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বাংলাদেশের অনেক শিশুই নিগৃহীত। অনগ্রসর শিশুদের মানবাধিকার রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে 'শিশু অধিকার ফোরাম' গঠিত হয়। শিশুদের অধিকার সম্পর্কে দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক পরামর্শ দান শিশু অধিকার ফোরামের প্রধান উদ্দেশ্য।

নারী অধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারিবারিক আইন এবং সাংবিধানিক আইন ইত্যাদি বিষয়সমূহের ওপর কাজ করে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' (আসক)। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি বাংলাদেশের মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত একটি মানবাধিকার সংস্থা হলো 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'। মানবাধিকার আন্দোলনের কারণে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে। মানবাধিকার রক্ষায় অবদান রাখার জন্য সংস্থাটি ১৯৯৭ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এর বাংলাদেশ শাখা কাজ করছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসকল বেসরকারি সংস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'ব্র্যাক'। এর যাত্রা শুরু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। 'ব্র্যাক' - এর কর্মসূচি শুরু হয় মূলত ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজের মাধ্যমে। আর্তমানবতার সেবায় এ সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। ব্র্যাকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করা। বাংলাদেশে যেসব সংস্থা ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে তাদের মধ্যে 'প্রশিকা' শীর্ষস্থানীয়। ১৯৭৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে 'প্রশিকা'র উদ্দেশ্য হলো এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার থাকবে এবং সকলে হবে গণতন্ত্রমনা।

বার বার মানবাধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হলেও মানবাধিকার রক্ষার জন্য উদ্যোগ খুব কমই গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গাই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। যার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন এক নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য বর্তমানে দেশে অনেক সরকারি-বেসরকারি সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাগুলো নিজ নিজ উদ্যোগে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি। সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজন মানবাধিকার রক্ষায় উপর্যুক্ত পদক্ষেপ ও তৎপরতা।

Z_¨wb‡'k

১. এএসএম মাহমুদুল হক, evsjv‡'‡ki msweavb, সুফি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫।

২. অধ্যাপক নির্মলকান্তি ঘোষ, AvaywbK ivóweÁv‡bi fwgKv, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৫।

৩. CEDAW হলো নারী অধিকার রক্ষায় প্রণীত সনদ বা চুক্তি।

৪. c_g Av‡jv, বুধবার, ৩০ মার্চ, ঢাকা, ২০১৬।

৫. AvBb I mwjk †K›' (AvmK), (জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০১৬) প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ৮, ২০১৭। ইন্টারনেট হতে সংগ্রহ করা হয় ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭।

৬. *Wikipedia,* সংগ্রহ করা হয় ২৪ শে নভেম্বর, ২০১৫।

৭. evsjv‡'k gwnjv cwil', লিগাল এইড উপ-পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি, নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের সংখ্যা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৫)।

৮. evsjv‡'k cwimsL¨vb e¨‡iv, ইন্টারনেট হতে সংগৃহীত, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৬।

৯. c_g Av‡jv, মঙ্গলবার, ২২ নভেম্বর, ঢাকা, ২০১৬।

১০. মিয়া মুহম্মদ সেলিম ও ডঃ লুৎফর রহমান, gvbewaKvi-mvgwRK b¨vqwePvi I mgvRKj¨vY, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৯৮।

১১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), evsjv‡'‡ki AvB‡b bvix wbhvZb cm½, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭৪।

১২. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম ও ডঃ লুৎফর রহমান, gvbewaKvi-mvgwRK b¨vqwePvi I mgvRKj¨vY, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৬৫।

১৩. বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও প্রথম আলোর ১লা মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত জরিপ।

১৪. c_g Av‡jv, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ঢাকা, ২০১৬।

১৫. মিয়া মুহম্মদ সেলিম ও ডঃ লুৎফর রহমান, gvbewaKvi-mvgwRK b¨vqwePvi I mgvRKj¨vY, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩০৭।

১৬. গেইল তুরিন, অনুবাদঃ অসিত রায়, AvZ‡¼i †‘qvj: evsjv‡‘k-fviZ mxgvš Í, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১৮. cv, 3, পৃ. ৩৬।

১৯. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, Retrieved, 16 March, 2016.

২০. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, Retrieved, 16 March, 2016.

Dhaka University Institutional Repository

cÂg Aa¨vq

5g Aa¨vq

gvbewaKvi msiÿY Ges fwel¨r c‘‡ÿc

একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পন করে মানুষের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে যেমন অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তেমনি অধিকারসমূহ সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মানবাধিকার বাস্তবায়ন নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। যেমন: ইসরাইলের হামলার কারণে প্যালেস্টাইনে অনেক সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছে, ইরাকে বোমা হামলায় নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, সিরিয়ায় যুদ্ধের কারণে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়েছে। কিন্তু এত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী মানুষ মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার যেমন লঙ্ঘিত হচ্ছে আবার মানবাধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টারও কোন ত্রুটি নেই। মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পরিবেশ। মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রাথমিক উৎস প্রধানত দুটি।

ক) একাধিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

খ) আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইন।

জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য পৃথিবীতে একাধিক দেশগুলোর মধ্যে শর্তসাপেক্ষে অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে রাষ্ট্রসমূহ নিজ দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন: মানবাধিকার বিষয়ে ইউরোপীয়ান কনভেনশন, আমেরিকার মানবাধিকার বিষয়ে কনভেনশন ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক প্রচলিত আইন হলো সার্বজনীন আইন। লিখিতভাবে না থাকলেও এটা সকলেই মেনে চলে। যেমন: দাসত্ব হতে

মুক্ত থাকা, অবাধ চলাফেরার অধিকার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই প্রচলিত আইনস্বরূপ মানবাধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

"মানবাধিকার" হলো মানুষের অপরিহার্য অধিকার, যা সে ভোগ করবে এবং চর্চা করবে অবাধে। এটি মানুষের অবিচ্ছেদ্য ও জন্মগত অধিকার। এই অধিকার কখনো অন্যের অধিকার নস্যাৎ করতে শিক্ষা প্রদান করে না। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য মানবাধিকার হলো নৈতিক ও আইনগত অধিকার। যার মূল উপাদান দুটি– জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার ৬০তম বার্ষিকী সগৌরবে পালিত হয়েছে ২০০৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর। এখানে দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে, নারী ও পুরুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং তাদের অধিকার সমান। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা রয়েছে। এখানে কোনো বৈষম্য বিদ্যমান নেই। এসব অধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহ একমত পোষণ করেছে। কিন্তু মানবাধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হলেও বিশ্বের অনেক দেশেই নারী পুরুষের বৈষম্যের কারণে নারীরা তাদের অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেক নারী তাদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কেই অবহিত নন। কিন্তু বর্তমানে মানবাধিকারের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। নিপীড়ন থেকে মুক্তির পাশাপাশি মানুষ হিসেবে নারীদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব বহন করছে।

যুগ যুগ ধরে মানবাধিকারের কথা উত্থাপন করা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর চর্চা শুরু হয়েছে অনেক পরে। মানুষের নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দীর্ঘকালীন। মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকার বিষয়গুলো গণদাবিতে রূপ লাভ করে। যেমন: দাস প্রথার বিলোপ।

১৮৬৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস প্রথার প্রচলন অব্যাহত ছিল। ইংল্যান্ডে ১৭৭২ সালে দাস প্রথাকে বাতিল করা হয়, যার ভিত্তিতে অন্যান্য উপনিবেশগুলোতে দাসপ্রথা ১৮০৭ সালে বাতিল বলে ঘোষিত হয়। ১৮১৪-১৮৮০ সালের মধ্যে দাস প্রথাকে বিলোপ করার জন্য সমগ্র ইউরোপজুড়ে অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্লিন সম্মেলনের মাধ্যমে ১৮৮৫ সালের মধ্যে আফ্রিকায় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।[১] পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের প্রায় ১৮ টি দেশ ব্রাসেলসে এক সম্মেলনের মাধ্যমে সবার সম্মতিক্রমে দাসপ্রথাবিরোধী আইন প্রণয়ন করে। দাসপ্রথায় একজন মানুষের অধিকার বলতে কিছুই থাকে না, যা পুরোপুরি অন্যায় ও অবিচারের সামিল। দাসপ্রথাবিরোধী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ প্রথাকে শুধু বেআইনী বলেই চিহ্নিত করা হয়নি বরং এর জন্য শাস্তি প্রদানের বিধানও রাখা হয়েছে। কিন্তু তবুও অনেক দেশে আজও নারীর সাথে দাস-দাসীর মত আচরণ করা হয়। নারীকে মনে করা হয় দাসী। তাঁর নিজের কোনো অধিকার নেই বলে মনে করা হয়। তাই দাসপ্রথাকে বিলোপ করার জন্য জাতিসংঘ কঠোরভাবে নিয়মনীতি পালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোনো ব্যক্তিই যাতে তার নৈতিক অধিকার হতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য সকল ধরনের সাহায্য দিতে জাতিসংঘ প্রস্তুত। জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে মানুষের জন্য। মানুষের অধিকার রক্ষাকে সকল ন্যায়নীতির উপরে স্থান দিয়েছে এই সংস্থা। মানবাধিকার নিয়ে জাতিসংঘ সনদের ২য় অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া মানবাধিকার রক্ষায় আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটির মত আন্তর্জাতিক সনদ তৈরি করা হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রতি বছর মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ পরিষদে অধিবেশন চলাকালে প্রতিনিধিরা কয়েকটি আলাদা আলাদা কমিটিতে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। এই কমিটিগুলোর মধ্যে একটি কমিটি মানবাধিকারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে। এই কমিটির পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেক সংস্থা রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান ভূমিকা

পালনকারী সংস্থাসমূহ হলো: মানবাধিকার কমিশন, সাব কমিশন, মানবাধিকার কমিটি। মানবাধিকার কমিশনকে মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। মানবাধিকার কমিশনের প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তসমূহকে জাতিসংঘ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত (কনভেনশন অন টর্চার) অর্থাৎ নির্যাতন বিষয়ক সনদটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে। মানবাধিকার কমিশনকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এই কমিশন মানবাধিকার সংক্রান্ত যেকোনো চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে পারে যেকোনো দেশের রাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নিষেধ করা হয়েছে জাতিসংঘ সনদের ৭ নম্বর ধারায়। কিন্তু জাতিসংঘই তার সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণের অধিকার প্রদান করেছে এবং তা গ্রহণও করবে জাতিসংঘ। এই বিষয়টিকে কেউ অসঙ্গতিপূর্ণ বলেনি। কারণ অভিযোগ পেলে সাব কমিশন ব্যক্তির তথ্য গোপন করে অভিযুক্ত সরকারের কাছে জবাব দাবি করবে। জবাব পাবার পর সাব কমিশন উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সবসময় মানবাধিকার কমিশন চেষ্টা করে সকল রাজনীতির উর্ধ্বে মানবতাকে রাখতে। যাতে করে মানবতার জয় হয় এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

জাতিসংঘ তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এর সিদ্ধান্তগুলো প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই সাধারণ পরিষদে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলো বিপুলভোটে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা আজ গৃহহীন হয়ে শরণার্থী শিবিরে জীবন কাটাচ্ছে, বিনা বিচারে মানুষ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, আইনের শাসনের নামে হাজার হাজার মানুষকে বিনা কারণে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় আজ জাতিসংঘ মানবাধিকার রক্ষায় যে কাজ করছে তা দিনের পর দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সকল রাষ্ট্রের উচিৎ মানবাধিকার রক্ষায় নিজ দেশের পাশাপাশি জাতিসংঘকেও সমর্থন দেওয়া।

মানবাধিকার সাব কমিশন নির্বাচিত হয় মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে। যেকোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই সাব কমিশনের সদস্য পদ পেতে পারে না। ব্যক্তি তখনই প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন, যখন কোনো সদস্য রাষ্ট্র তার নাম প্রস্তাব করবে। ব্যক্তি নির্বাচিত হলে যে কারো দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কোনো রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাব কমিশনের সদস্য পদ রয়েছে মোট ছাব্বিশটি। এগুলোকে জাতিসংঘ পৃথিবীর পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল বিষয়ই সাব কমিশনে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে এর সিদ্ধান্ত মানবাধিকার কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মানবাধিকার কমিটি গঠন করে থাকে জাতিসংঘ। এই কমিটি মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন-কানুন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। মানবাধিকার কমিটি বিভিন্ন বিষয়াবলী অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করে। এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়।

মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘ ইচ্ছা করলেই যেকোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। মনে রাখতে হবে নাগরিকদের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম। তাই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মর্যাদা সমান গুরুত্বের সাথে রক্ষা করতে হবে। প্রতিটি দেশের শক্তির উৎস হলো জনগণ। বর্তমানে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সভা, সেমিনার হচ্ছে। মানবাধিকার সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। এখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে যেকোনো দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। জাতিসংঘের সফলতা বা ব্যর্থতা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর নয়। এই সফলতা ও ব্যর্থতা জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে সমানভাগে ভাগ করে নিতে হবে। কারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কারো একার দায়িত্ব নয়, বরং তা সকলেরই কর্তব্য। বিশ্বের অনেক দেশ তাদের শাসনতন্ত্রে মানবাধিকার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো অনেক দেশ এই বিষয়টিকে অনুসরণ করে না। তাই

আজ মানবতার জন্য সচেতনতা অপরিহার্য। মানুষ তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের হার ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে এবং পরবর্তীতে মানবতার জয় হবে।

যুদ্ধ মানুষের জন্য কখনো শান্তি বয়ে আনে না। কিন্তু এই বিশ্ব এখন পর্যন্ত দুটো বড় বড় যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধের কারণে মানুষ হারিয়েছে তাঁর ন্যায্য অধিকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্যাতন ও নিপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটাতেই মূলত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিরলস ৪ বছরের প্রচেষ্টার ফসল হলো জাতিসংঘ। চার্চিল, রুজভেল্ট এবং স্টালিন ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তেহরানে এক আলোচনায় মিলিত হন। পরবর্তীতে তারা বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা দেন, সকল দেশকে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হবে। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটাই হলো জাতিসংঘ। ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকসে ১৯৪৪ সালের আগস্টে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই সকলের প্রস্তাব অনুসারে জাতিসংঘের নামকরণ করা হয়। জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় যে নিরাপত্তার বাণী ছিল, তা নিছক একটি ঘোষণায় পরিণত হয়। তাই জাতিপুঞ্জের সকল দূর্বলতাকে অতিক্রম করে শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতিসংঘ।

ব্যক্তির মর্যাদা, নারী-পুরুষভেদে সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রতি জাতিসংঘ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে জাতিসংঘ। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাকে অনুসরণ করতে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের প্রণেতাগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন এর লক্ষ্যসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। ব্যক্তির মর্যাদা, নারী-পুরুষভেদে সকলের সমান অধিকার ভোগ জাতিসংঘের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। জাতিসংঘের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো সকল আন্তর্জাতিক আইন ও বাধ্যবাধকতা সম্মানের সাথে পালন করতে হবে।

মানুষ স্বাধীনভাবে উন্নত জীবনযাপন করবে, যা তৃতীয় লক্ষ্যে উল্লেখ করা আছে। সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের লক্ষ্যসমূহকে সহনশীলভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য। সহনশীল মনোভাব সঠিকভাবে অনুসরণ করলে বিশ্বে যুদ্ধ ও সংঘাত বলে কিছু থাকবে না। আন্তর্জাতিকভাবে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার জন্য সকল রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এককভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এছাড়া কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারবে না।

সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয় যুদ্ধের কারণে। যুগ যুগ ধরে যুদ্ধের কারণে যে ধ্বংসযজ্ঞের প্রক্রিয়া চলছে, তা থেকে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। যেমন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে লিটলবয় ও ফ্যাটম্যান নামক দুটো পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ করে। যার ফলে শহর দুটোর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধ কখনো মানুষের জন্য শান্তি বয়ে আনে না। যুদ্ধের ফলে অনেক মানুষ তার ন্যায্য অধিকার হারিয়ে ফেলে। ১৭৪৫ সালে ফন্টেনয় যুদ্ধের সমাপ্তি হলে পঞ্চাদশ লুই শত্রুপক্ষীয় বন্দি, আহত সৈন্যদের প্রতি সদাশয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২] কারণ বন্দি আহত সৈন্যরা মানুষ হিসেবে তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে পারে, তাদের এই অধিকার হতে বঞ্চিত করা অন্যায়।

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসযজ্ঞ পর্যবেক্ষণ করে মানবতার চেতনায় সিক্ত হয়ে হেনরি ডুনান্ট সকলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন রেডক্রস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রেডক্রস কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পরে লীগ অব নেশন্স এর জন্ম হলে এর ২৫ নং অনুচ্ছেদে রেডক্রসের মর্মবাণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৩] যার ধারাবাহিকতা এখন জাতিসংঘ বহন করছে। রেডক্রস সংস্থাটির সকল উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থাকে ঠিক রেখে মুসলিম বিশ্বে এর নামকরণ করা হয় রেডক্রিসেন্ট। ইরানে একে রেডলায়ন

বলা হয়। বিশ্ব মানবতার আইন রেডক্রসের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় তা মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য আরো সহজ হয়েছে।

মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য অনেক আইন, চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকারের বিষয়টি সবসময় অবহেলিত হয়েছে। সর্বপ্রথম এই বিষয়টি সকলের দৃষ্টিতে আসে ১৯১৯ সালের এক সম্মেলনে। অধিকার সকলের জন্য সমান, তাই সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার অর্থাৎ আইনের চোখে সমতা, ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ ভাষাগত স্বাধীনতা সবই সনদে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের অধিকারকে লীগ অব নেশন্সের মাধ্যমে সুসংহত করা হয়েছিল। যেমন, আলবেনিয়ার সংখ্যালঘুদের একটি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হলে আদালত সিদ্ধান্তটি অবৈধ বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে জাতিসংঘও সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মানবিক অধিকারগুলোর প্রতি অবজ্ঞার পরিণামস্বরূপ বিভিন্ন বর্বরোচিত ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য খুবই দুঃখজনক। তাই মানুষের অধিকারগুলো যাতে কোনোরূপ অবজ্ঞার মুখোমুখি না হয় এবং এগুলো ঠিকমত সংরক্ষণ করা যায় সেজন্য জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রকাশ করে। জাতিসংঘের সনদেও জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকার, মানুষের মূল্য এবং নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান বছরগুলোতে এশিয়া মহাদেশের কিছু দেশে শিশু, কিশোর ও তরুণদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানির মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ও কিশোরদের যৌন নির্যাতন ও দেহব্যবসায় বাধ্য করার ঝুঁকি অনেক বেড়েছে। যৌন নির্যাতনের শিকার এসকল শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের জন্য জাতিসংঘের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ) দক্ষিণ ও দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার ১২টি দেশে একটি

আঞ্চলিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এই দেশগুলো হলো-চীন, লাওস, কম্বোডিয়া, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ফিলিপাইন ও শ্রীলংকা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হলো তরুণসমাজ ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও এর বিকাশ সাধন করা।[৪]

জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত এসকাপ এর প্রকল্পের প্রথম লক্ষ্য হলো মেকং উপ-অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়ায় নির্যাতিত ও শোষণের শিকার শিশুদের সকল অবস্থা যাচাই করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে উক্ত শিশুদের যে সেবা দান করা হচ্ছে তার স্বরূপ পর্যালোচনা করা। তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে নির্যাতনের শিকার শিশুদের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সরকার, এনজিও ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা। সমাজকর্মীদের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালু, নির্যাতনের শিকার শিশুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের বিকাশ হলো এই প্রকল্পের চতুর্থ লক্ষ্য।

শিশুশ্রমের মূল কারণই হলো দারিদ্র। শিশুশ্রমের কারণে বর্তমানে বিশ্বের অনেক শিশু তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত। আইএলও-এর হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৫ থেকে ১৪ বছরের ২৫ কোটিরও বেশি শিশু এখন বাধ্যতামূলকভাবে পূর্ণ বা খণ্ডকালীন পরিশ্রমের কাজের সাথে জড়িত ।[৫] এসকল শিশুদের বেশির ভাগই এশিয়া মহাদেশে বাস করে। এসব শিশু নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক বিকাশের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ। আইএলও- এর নতুন পদক্ষেপ অনুযায়ী যে নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে এসকল ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের দুর্ভোগ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

আইএলও-এর নতুন নীতিমালার লক্ষ্যই হচ্ছে শিশুশ্রম বন্ধ করা। নতুন নীতিমালায় ১৯৭৩ সালের ন্যূনতম বয়স-সংক্রান্ত কনভেনশন (নং ১৩৮) এবং এর সাথে যুক্ত কনভেনশন (নং ১৪৬) কে জোরদার করা হবে। এই নীতিমালায় মাদকপাচারে শিশুদের ব্যবহার নিরোধ, দাসত্ব ও বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে শিশুশ্রম বন্ধের জন্য ১৮টি দাতা দেশের অর্থানুকূল্যে আইপিইসি এশিয়া মহাদেশের ৯টি দেশে কর্মসূচী পরিচালনা করছে। এই কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো শিশুশ্রম নিবারণের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। ১৯৮৯ সালে সম্পাদিত শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনটি বেশিসংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু জরিপে দেখা যায়, প্রতিদিন পাঁচ হাজার শিশু বাসস্থান হারাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। সংস্কৃতির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের আরেকটি অর্থ হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন। তাই আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে কয়েকটি সমাজভিত্তিক প্রকল্প চালু করেছে ইউনেস্কোর সংস্কৃতি বিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টার দপ্তর। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃতির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলোকে আধুনিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিকশিত করে তোলা। সাংস্কৃতিক নীতির প্রধান কাজই হলো সাংস্কৃতিক বিকাশ পূরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাই বক্তব্যের মাধ্যমে সংহতি প্রকাশিত হয়েছে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত "উন্নয়নের প্রয়োগে সাংস্কৃতিক নীতিমালা" সংক্রান্ত আন্তঃসরকার সম্মেলনে। এসব বক্তব্যের আলোকে ইউনেস্কো এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচী এমনভাবে সাজিয়েছে, যাতে সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়।

বর্তমান বিশ্বে শরণার্থীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। শরণার্থীরাই সম্ভবত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় শিকার। শরণার্থীরা সাধারণত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয় যখন তারা

নিজ বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়, এমন কি অন্য কোনো জায়গায় আশ্রয়লাভের সময়ও তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। সকল শরণার্থীই কোনো না কোনো পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে থাকে। বর্তমানে এই বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য যতই কাগজে কলমে লেখা হোক না কেন, এমনকি যতই আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন বাস্তবে তার অনেক কিছুই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। বরং প্রতিনিয়ত স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত ১৯৫১ সালের কনভেনশনটি সর্বজনীন ঘোষণার আদর্শসমূহ বাস্তবায়নের চুক্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম।[৬] এই কনভেনশনটি সম্পাদিত হয়েছে সর্বজনীন ঘোষণার ১৪ নং অধ্যায়ের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, 'অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতন হতে আত্মরক্ষার জন্য অন্য দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার সকলের আছে'। ১৯৬৭ সালের প্রটোকলসহ এই কনভেনশন গ্রহণ করেছে ১৩৬ টি দেশের সরকার। কনভেনশনে শরণার্থীদের চাহিদাসমূহের প্রতি সঠিক সাড়াদানের জন্য নীতিমালার ভিত্তি নির্দেশ করা হয়েছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংগঠিত চুক্তিসমূহের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ জাতিসংঘের এই কনভেনশনকে আরো বেশি জোরদার করেছে। এই উদ্দেশ্যে এশিয়ায় ব্যাংকক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, নীতিমালাটি অনেক দেশেই উপেক্ষিত। শরণার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যু সমাধানের প্রক্রিয়া এবং এর আইনগত ভিত্তিসমূহ এশিয়ার দেশগুলোতে অনেক বেশি উপেক্ষিত। তবে উপেক্ষার বিষয়টি বর্তমানে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কারণ বর্তমানে অনেক দেশেই শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের ঘরে ফেরার অধিকার দেয়া হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী ও শিশুরাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। তারাই মূলত দুর্ভোগের প্রধান ভাগ্যবঞ্চিত অংশ।

কর্মকালীন মৌলিক নীতি ও অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা বিপুলভোটে আইএলও-এর ৮৬ তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। কর্মকালীন মৌলিক নীতি প্রণয়ন করা এবং কার্যকর করা প্রতিটি রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশে এ দায়িত্ব পালন করা হয় না। বাংলাদেশে ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসের কারণে অনেক শ্রমিক নিহত হয়, অনেকে পঙ্গু হয়ে যায়। কারণ রানা প্লাজায় অবস্থানরত গার্মেন্টসসমূহের সঠিক কোনো নীতিমালা ছিল না। তাই কর্মকালীন মৌলিক নীতি ও অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণায় বৈষম্যের অবসান, পুরোপুরি শিশুশ্রম বিলোপ ও সমিতি গঠনের অধিকার সম্পর্কিত আইএলও-এর সাতটি মৌলিক কনভেনশনের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

মানুষে মানুষে সাম্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" নীতির মধ্যে। সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশ্বের সকল অঞ্চলের মানুষ তাদের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সর্বোচ্চ মান ও স্বাস্থ্যসেবা লাভ করতে পারবে। মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের মাধ্যমে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলো তাদের জনগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক হবে এমন পরিবেশ লাভ করার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ বিশ্বে এমন অনেক অনুন্নত দেশ আছে যেখানে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে। তাই সবার জন্য স্বাস্থ্য যাতে সম্ভব হয় সেজন্য পদক্ষেপ আবশ্যক। স্বাস্থ্যের জন্য অনেক দেশে এখনো সহায়ক পরিবেশ নেই, এসব দেশে প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের বসতির অধিকার একটি অন্যতম প্রধান অধিকার। আজ বিশ্বের অনেক মানুষ বাসস্থানজনিত সমস্যায় জর্জরিত। আবাসনের সংকট নিরসনের জন্য হ্যাবিটাট নামক আশ্রয়ণ কর্মসূচি একটি দুই ধারার কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। প্রথম কৌশল হলো, স্বল্প আয়ের মানুষের

চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখা। এমন ধারার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা যা আবাসন বাজারকে চাঙ্গা করে তুলতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত হ্যাবিটাট এজেন্ডা স্বল্প আয়ের মানুষের বসতি একতরফাভাবে উচ্ছেদ ও ভেঙ্গে দেয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করে। যদি উচ্ছেদ করা অপরিহার্য হয় তবে সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোকে এই পরামর্শ দেয় যাতে উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলোর জন্য আবাসনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পর্যাপ্ত আবাসন মানবাধিকারের বিষয়টি জোরদার করে তোলে। পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা থাকলে তা বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য সন্তোষজনক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

জাতিসংঘকে মানবাধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম কাণ্ডারী বলা হয়। জাতিসংঘের আদর্শ, লক্ষ্য, কাঠামোগত ভিত্তি সকল বিষয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে জাতিসংঘ সনদ। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের মধ্যে জাতিসংঘ সনদ অন্যতম। তাছাড়া মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত প্রথম পদক্ষেপ বলা হয় জাতিসংঘ সনদকে। এরপর ১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও গ্রহণের যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের মুখবন্ধে এটাকে মানবাধিকার পরিমাপ করার আন্তর্জাতিক মানের মাপকাঠি বলা হয়েছে। বিশেষত্ব দেওয়ার ফলে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের গুরুত্বকে কোনো রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণাটি জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রে গৃহীত হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ছাড়াও জাতিসংঘ আরো কতিপয় মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেছে। গণহত্যা বন্ধ এবং গণহত্যা অপরাধের কারণে শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত দলিলটি আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে কার্যকর হয়। বর্ণবৈষম্যের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাই সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য জাতিসংঘ ১৯৬৫ সালে আন্তর্জাতিক কনভেনশনের মাধ্যমে সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য নিষিদ্ধ করে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুর সকল ধরনের অধিকার রক্ষা করা প্রতিটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই শিশুদের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৯ সালে

শিশুর অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশনটি আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। জাতিসংঘে ১৯৮৪ সালে মানুষের ওপর সকল প্রকার নৃশংসতা, নির্যাতন ও অমানবিক ব্যবহার নিরোধ করার জন্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনটি আন্তর্জাতিক আইনস্বরূপ গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতি বিদ্বেষমূলক অপরাধ নিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনটি দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বিদ্বেষমূলক অপরাধের আলোকে প্রচলিত হয়। নারীদের ওপর সকল প্রকার নির্যাতন রোধে ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিকভাবে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। নারীর সকল ধরনের মানবাধিকার রক্ষার জন্য কনভেনশনটি কতিপয় শর্ত আরোপ করে।

জাতিসংঘে মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কমিটি কাজ করে থাকে। যেমন: মানবাধিকার কমিটি, নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি, বর্ণ বৈষম্য রোধে কমিটি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কমিটি, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি, শিশুর অধিকার রক্ষা সম্পর্কিত কমিটি।

বিশ্বে শান্তি স্থাপনের অন্যতম বিষয় হলো স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মানবিক অধিকারগুলো এমনভাবে অবজ্ঞার সম্মুখীন হচ্ছে যা মানবজাতির জন্য অমর্যাদাকর। সাধারণ মানুষ অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েই সোচ্চার হয়। তখনই মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করতে পারে। জাতিসংঘ সনদের প্রতি জনগণ তাদের আস্থা ব্যক্ত করে আসছে। কিন্তু এখনও বিশ্বের সব মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র বর্তমানে মানবিক অধিকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। মানবাধিকারের মূল কথা হলো পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, বৈষম্য দূরীকরণ, স্বাধীনতা এবং সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘ ১৯৪৬ সালে মানবাধিকার কার্যক্রমকে বিস্তৃত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষার জন্য কমিটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। জাতিসংঘ জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক এক রেজুলেশন পাশ হয় ১৯৬০ সালে। জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের ওপর ১৯৯১ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন এক আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠন, আন্ত-সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বিস্তৃত সুপারিশমালা গ্রহণ করে, যা ১৯৯৩ সালে রেজুলেশন হিসেবে সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়।

Z_¨wb‡‘k

১. মোঃ শহীদুল ইসলাম, gvbewaKvi: ZË-Z_¨, সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৩।

২. cv¸³, পৃ. ৩৪।

৩. cv¸³ ।

৪. তোফাজ্জল হোসেন, RwZmsN, আগামী প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ২৯৪।

৫. cv¸³, পৃ ২৯৯।

৬. cv¸³, পৃ ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

মানবাধিকার সম্পর্কিত ইতিহাস অনেক পুরানো। অনেক পূর্ব থেকে আলোচনা হলেও বর্তমানে মানবাধিকারের আলোচনা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। মানবাধিকার হলো মানুষের এমন অধিকার যা ব্যতীত মানুষ সমাজে বসবাস করতে পারে না। তাছাড়া অন্যের অধিকার হস্তক্ষেপ না করে অন্যের মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো অন্যতম নৈতিক অধিকার। চিন্তা ও আবিষ্কারের শক্তি নিয়ে মানুষ জন্মেছে। এই শক্তির প্রয়োগের অন্যতম নাম হলো মানবাধিকার। অকারণে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। স্থান, সময়ভেদে মানবাধিকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যুগের পর যুগের পরিবর্তন হবে, মানুষের জীবনযাপনে পরিবর্তন আসবে, শুধু পরিবর্তন হবে না মানবাধিকারের। মানবাধিকার হলো চিরন্তন ও সার্বজনীন।

ন্যায়বিচার বিষয়টি মানবাধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সমাজে ন্যায়বিচার তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সকলের মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে। ব্যক্তি নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সমাজের কাছ থেকে কিছু অধিকার প্রাপ্য হয়। সমাজে ন্যায়বিচারের ভিত্তি হলো আইনের শাসন। আইন হলো এমন সামাজিক বিধান যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হতে নিজেকে বিরত রাখে। সমাজ বড় বিচিত্র। এখানে যেমন রয়েছে ন্যায়বিচারের রক্ষক তেমনি রয়েছে ন্যায়বিচারের ভক্ষক। যাদের কারণে মানবতা লাঞ্ছিত হচ্ছে। অথচ বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য ন্যায়বিচারের কোনো বিকল্প নেই। সুবিচার ছাড়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সামাজিক ভারসাম্যের অন্যতম ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার। অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকার হলো সকল মানুষের ন্যায্য ও নৈতিক অধিকার। পাশাপাশি ন্যায়বিচার হলো একটি আদর্শ। যার সাহায্যে মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই মানবাধিকার বিষয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রটি জারি করা হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রটির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অনেক দেশ তাদের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে সংযুক্ত করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহের সাথে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনেক ধারার মিল রয়েছে। অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ফলে সমাজে অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, সীমান্ত সংঘাত, সংখ্যালঘু নির্যাতন, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি নানাভাবে মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে।

মানবাধিকার কোনো শ্রেণী বা ব্যক্তির একক অধিকার নয় বরং মানবাধিকার হলো মানুষের সহজাতভাবে প্রাপ্ত অধিকার। যা কেউ কারো নিকট থেকে কেড়ে নিতে পারে না। মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানবাধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করছে। নাগরিকদের সকল অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র ইচ্ছামত নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু সংবিধানের বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সমাজে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ সমগ্র বিশ্বে বহু মানুষ প্রতিনিয়ত ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ন্যায়বিচারের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন নেই বললেই চলে। প্রতিটি দেশে মানবাধিকার রক্ষার আইন

আছে অথচ এর বাস্তব প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই নেই। যেমন: যুদ্ধ, সীমান্ত সংঘাত, বোমা হামলা, হামলা-পাল্টা হামলা, শরণার্থী ইত্যাদি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আইন থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ধীরে ধীরে মানবাধিকার সম্পর্কে মানুষের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। মানবাধিকার রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু সচেতনতা সত্ত্বেও মানবাধিকার সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে পদে পদে। তাই আজ সকল বিদ্বেষ, সহিংসতা ভুলে মানবতার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। এছাড়া জাতিসংঘসহ সকল সংস্থাসমূহকে মানবাধিকারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা নিতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বের শান্তি রক্ষার জন্য মানুষের অধিকারকে আজ প্রথম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই এর মাধ্যমে বিশ্বসহ বাংলাদেশেও সুবিচার, সুশাসন এবং মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে।

MšcwÄ

1. Ahmed, Imtiaz(edited), *Human Rights In Bangladesh: Past, Present And Futures*, The University Press Limited, Dhaka, 2014.

২. Arora, Latif Kumar(ed.), *Major Human Rights Instruments*, Isha Books, India, 2006.

3. Aswal, B.S., *Women And Human Rights,* Cyber Tech Publication, Delhi, 2010.

4. Barrow, Robin, *Injustice, Inequality And Ethics: A Philosophical Introduction To Moral Problems*, Barnes And Noble Books, Totowa, New Jersey, 1982.

5. Clapham, Andrew, *Human Rights: A Very Short Introduction*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2007.

6. Donnelly, Jack, *International Human Rights,* Fourth Edition, Westview Press, Boulder, 2013.

7. Donnelly, Jack, *Universal Human Rights In Theory And Practice,* 3rd Edition, Cornell University Press, Ithaca, New York, 2013.

8. Hospers, John, *Human Conduct: An Introduction To The Problems Of Ethics,* Brooklyn College, Harcourt, Brace and World, Inc., New York, 1961.

৯. Lauren, Paul Gordon, *The Evoluation Of International Human Rights Visions Seen*, University Of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003.

10. Mapp, Susan C., *Human Rights And Social Justice In a Global Perspective: An Intraduction To International Social Work*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

11. Maritain, Jacques, *Man And The State*, Catholic University Of America Press, Washington, 1998.

12. Miah, M. Maniruzzaman, *State Of Human Rights In Bangladesh And Related Issues*, Sikder Abul Bashar Gatidhara, Dhaka, 2001.

13. Morsink, Jahannes, *The Universal Declaration Of Human Rights Origins, Drafting and Intent*, University Of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1999.

14. Neier, Aryeh, *The International Human Rights Movement: A History*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2012.

15. Paul, R. C., *Protection Of Human Rights*, Commonwealth Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 2011.

১৬. Rawls, John, *A Theory Of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1971.

17. Singer, P.(ed.), *A Companion To Ethics*, Blackwell Publishers, Oxford, 1991.

১৮. Smith, R.K.M., *International Human Rights*, Oxford

University Press, Oxford, 2007.

19. Stearns, Peter N., *Human Rights In World History,* Routledge, Abingdon, Oxon, 2012.

20. Steiner, Hilled, *An Essay On Rights,* Blackwell Publishers, Oxford, 1994.

২১. Watson, Susan, Global Citizenship: *Understanding Human Rights, Smart Apple Media,* Canada, 2004.

22. Wellman, Carl, *The Moral Dimensions Of Human Rights,* Oxford University Press, Inc., New York, 2011.

২৩. Whelan, Daniel J., *Indivisible Human Rights A History,* University Of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010.

২৪. আকন্দ, মওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার (অনুবাদ), †gŠwjK gvbewaKvi, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪।

২৫. আহমদ, এমাজউদ্দীন(অনূদিত), Avi. Gg. g¨vKvBfvi: AvaywbK ivó, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭।

২৬. ইসলাম, ড. মো. নুরুল, gvbewaKvi I mgvRKg, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫।

২৭. ওয়াহিদ, আল, bvMwiK Ww‡qix, আলোড়ন প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২।

২৮. উদ্দীন, মুহাম্মদ আয়েশ, ivóªPš Í v cwiwPwZ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৬।

২৯. করিম, সরদার ফজলুল, †cø‡Uvi wicvewjK, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৪।

৩০. করিম, সরদার ফজলুল(অনুবাদ), Gwi÷Uj-Gi cwjwU·, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৩।

৩১. খালেক, এ. এস. এম. আব্দুল, cv‡qvwMK bxwZwe‘¨v, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৩।

৩২. খালেক, এ. এস. এম. আব্দুল, mvgvwRK b¨vqwePvi I ijm, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১০।

৩৩. খাতুন, সফিয়া, bvixi AwaKvi I Ab¨vb¨, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

৩৪. খানম, আয়শা, bvixi gvbewaKvi I ÿgZvq‡bi c‡_, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫।

৩৫. খান, আখতার সোবহান, gvKmev‘ I b¨vqciZvi avivYv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

৩৬. খান, মোহম্মদ দরবেশ আলী, †cø‡Uv I G¨vwi÷U‡ji ivR‰bwZK wPšÍv, দীপ প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৭।

৩৭. ঘোষ, অধ্যাপক নির্মলকান্তি, AvaywbK ivóweÁv‡bi fwgKv, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৯৩।

38. চৌধুরী, আবু সাঈদ, gvbewaKvi, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।

৩৯. তুরিন, গেইল, রায়, অসিত(অনুবাদ), AvZ‡¼i †‘qvj evsjv‡‘k-fviZ mxgvšÍ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬।

৪০. দাশ, প্রাণগোবিন্দ, ivówPšÍvi BwZeË, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৮৬।

৪১. পাটোয়ারী , ড. এ.বি.এম. মফিজুল ইসলাম, এবং আখতারুজ্জামান, মোঃ, (গবেষণা-সহযোগী), gvbewaKvi I AvBbMZ mnvqZv‘v‡bi gjbxwZ, হিউম্যানিস্ট এন্ড ইথিক্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

৪২. বারী, মুহম্মদ আবদুল, bxwZwe‘¨v, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮২।

৪৩. ভুঁইয়া, ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, AvaywbK ivóªweÁvb, এন এস পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৭৭।

৪৪. রশীদ, হারুন, gvKmxq ‘kb, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭।

৪৫. রশীদ, মোহাম্মদ হারুন অর, AvB‡bi kvmb I gvbevwaKvi, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৪।

৪৬. রহমান, ড. মো. মকসুদুর, ivóxq msMV‡bi iƒc‡iLv, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০১৩।

৪৭. সেলিম, মিয়া মুহম্মদ, ও রহমান, ড. লুৎফর, gvbevwaKvi mvgwRK b¨vqwePvi I mgvRKj¨vY, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫।

৪৮. হামিদ, মোঃ আব্দুল, bvix I wkï wbhvZb cwZKvi weIqK AvBb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০।

ceÜmgn

১. evsjv‡‘‡ki AvB‡b bvix wbhvZb cm½, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), লালমাটিয়া, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৫।

২. bvix AwaKvi, †gŠwjK AwaKvi, gvbewaKvi, wej Ae ivBUm, RvZxq msm‘ I bvMwiK ‘wqZmgn, প্রকাশনায় চেঞ্জ মেকারস্, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৬।

৩. cwZewÜZv I gvbewaKvi: evsjv‡‘k (†cwÿZ), এ্যাকশন অন ডিজ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিডি), ঢাকা, (বাংলা অনুবাদ) মে, ২০০৯।

৪. RvZxq gvbewaKvi Kwgk‡b Awf‡hvM ‘v‡qi: gvbewaKvi Kgxi e¨enwiK cw¯ÍKv, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), লালমাটিয়া, ঢাকা, এপ্রিল, ২০১২।

৫. *Human Rights Magazine 2014*, Human Rights and peace for Bangladesh, October, 2014.

৬. gvbewaKvi evsjv‡‘k 2015, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৬।

৭. *Human Rights In Bangladesh,* Ain O Salish Kendra (ASK), *2005,* Dhaka, 2006.

৮. c_g Av‡jv, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৮৫, ১০৬, ১৪০, ১৪৭, ২৩৯, ২৪৮, ২৪৯, ৩৪৬, ৩৫১, ঢাকা, ২০১৬।

৯. -------, বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১৯, ২০, ২৭, ৫৬, ঢাকা, ২০১৬।

১০.-------, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৩২, ঢাকা, ২০১৭।